সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

# ভারত বিচিত্রা

আগস্ট ২০২৩

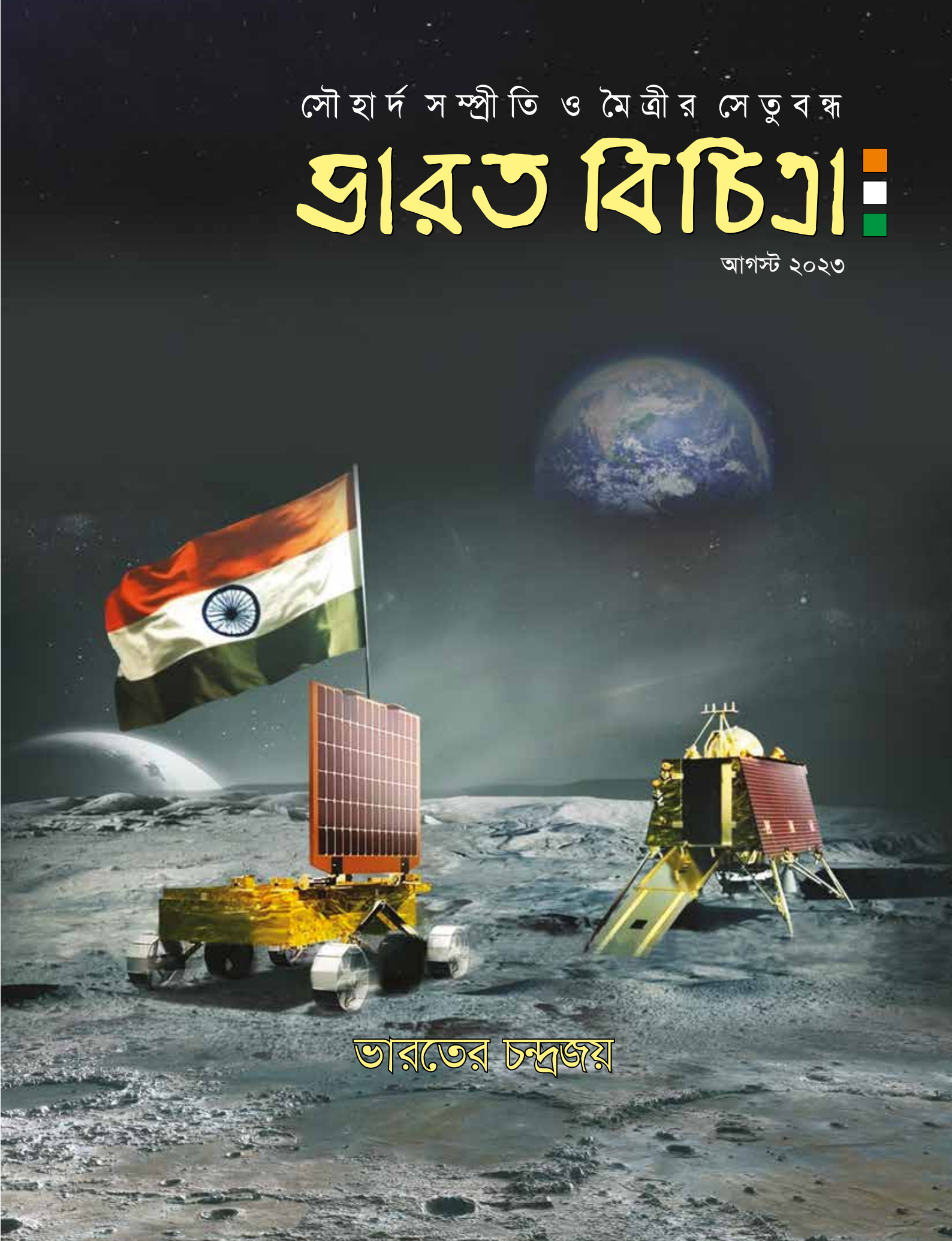

## ভারতের চন্দ্রজয়

ভারতের প্রেসিডেন্সির অধীনে ৯-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'জি২০ সামিট : ঢাকা টু নিউ দিল্লি' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে ৩১ আগস্টে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা বক্তব্য প্রদান করেন।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৫ম বার্ষিক প্রতিরক্ষা সংলাপ (এডিডি) ২৮ আগস্ট ২০২৩-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী গিরিধর আরামানে, ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব এবং বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, এসজিপি, পিএসসি, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার যৌথ ভাবে এই এডিডি-এর সভাপতিত্ব করেন।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা এবং বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক যৌথভাবে ২৭ আগস্ট ২০২৩-এ চট্টগ্রামে নলেজ পার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, যা ভারত সরকারের অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে।

ভারত প্রজাতন্ত্রের সরকার এবং BIMSTEC এর মধ্যে BIMSTEC Center for Weather and Climate (BCWC) এর মধ্যে আয়োজিত হোস্ট কান্ট্রি চুক্তি ২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ঢাকায় ভারতের হাই কমিশনে স্বাক্ষরিত হয়।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মাকে বাংলাদেশের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি) ২০ আগস্ট ২০২৩-এ 'কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়া : ইটজ ফরেন পলিসি; সিকিউরিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি; অ্যান্ড ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ রিলেশন্স'-এ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও সিভিল সার্ভিস থেকে আগত ২০২৩ সালের এনডিসি কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

# ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫১ | সংখ্যা ০৮ | শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩০ | আগস্ট ২০২৩

**High Commission of India, Dhaka**
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

**Bharat Bichitra**
/BharatBichitra

**অরবিন্দ চক্রবর্তী**
সম্পাদক
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স : ১১৪২
মোবাইল : +৮৮০১৮৫২০৪৬০২৮
e-mail : inf2.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
**ভারতীয় হাই কমিশন**
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিকস শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা
মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত
*ভারত বিচিত্রায়* প্রকাশিত সব রচনার মতামত
লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগ নেই।
এ পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়।

## কেন্দ্রবিন্দু
## তামিলনাড়ু

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে অন্যতম তামিলনাড়ু। ভারতীয় উপদ্বীপের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত এই রাজ্যের সীমানায় রয়েছে পুদুচেরি, কেরল, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ। তামিলনাড়ুর ভৌগোলিক উত্তর সীমায় পূর্বঘাট, পশ্চিম সীমায় নীলগিরি, আন্নামালাই পর্বত ও পালাক্কাদ, পূর্ব সীমায় বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ পূর্ব সীমায় মান্নার উপসাগর ও পক প্রণালী এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর অবস্থিত।

## সূচিপত্র

প্রচ্ছদরচনা — চাঁদের দক্ষিণ মেরু জয় করল ভারতের বিক্রম ॥ সন্দীপন ধর ০৪
স্বাধীনতা দিবস — রাঙাও ভারত বাসন্তী রঙে ॥ পীযূষকান্তি বিশ্বাস ০৮
প্রবন্ধ — চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ ॥ দীপক লাহিড়ী ১০
রবীন্দ্রসাহিত্যে ক্যামেরা ॥ সুদীপ্ত সালাম ১৪
শতবর্ষ পেরিয়ে 'অগ্নি-বীণা' ॥ খান মাহবুব ১৮
শামসুর রাহমান কালের ধুলোয় অমলিন ॥ কুমার দীপ ৩৩
ছোটগল্প — অমৃতস্য পুত্রাঃ ॥ কুমার অরবিন্দ ২১
পঙ্‌ক্তিমালা — মলয় রায়চৌধুরী ॥ কাজল চক্রবর্তী ॥ সুশীল মণ্ডল
মাহফুজ আল-হোসেন ॥ সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ॥ বীরেন মুখার্জী
বিপুল অধিকারী ॥ শৈলজানন্দ রায় ॥ বিপ্লব রায় ॥ স্নিগ্ধা বাউল
নিলয় রফিক ॥ অম্বরীশ ঘোষ ২৪-২৫
অনূদিত কবিতা — জয়ন্ত মহাপাত্রের পাঁচটি কবিতা
অনুবাদ ও ভূমিকা : আলম খোরশেদ ২৬
জন্মশতবর্ষ — ওয়ালীউল্লাহ্‌র শতবর্ষে ফিরে পড়া 'লালসালু' ॥ গৌতম রায় ২৮
ধারাবাহিক উপন্যাস — বহ্নিলতা ॥ অমর মিত্র ৩৭
কেন্দ্রবিন্দু — তামিলনাড়ু ॥ মিজান স্বপন ৪১
বিশেষ নিবন্ধ — প্রাচীন ভারতে রূপচর্চা ॥ শামিম আহমেদ ৪৫
শেষ পাতা — বন্দেমাতরম্ ॥ আমিরুল আবেদিন ৪৮

ভারতীয় হাই কমিশন ১৫ আগস্ট ২০২৩-এ ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করেছে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অংশ হিসেবে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে এই উদ্‌যাপন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং বাংলাদেশে অধ্যয়নকারী ও কর্মরত ১০০০-এরও বেশি ভারতীয় নাগরিকের সামনে জাতির উদ্দেশে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ পাঠ করেন।

# সম্পাদকীয়

২৩ আগস্ট ২০২৩ এই দিনটি ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কেননা এই দিন ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে চন্দ্রযান-৩ এর বিক্রম লান্ডার সফলভাবে চাঁদের মাটি স্পর্শ করেছে। চাঁদে নভোযান অবতরণের হিসাব করলে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের পর ভারত চতুর্থতম সংযোজন। আর চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চল অবতরণের দিক থেকে তারাই প্রথম দেশ হিসেবে সফলতার চূড়া ছুঁতে সক্ষম হলো। ২০০৮ সালে ভারতের প্রথম চন্দ্র অভিযান; প্রথম দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-১ নিয়ন্ত্রিতভাবে চাঁদে আছড়ে ফেলা হয়েছিল সেটি। অর্থাৎ হার্ড ল্যান্ডিং করানো হয়েছিল। কিন্তু সেটি কিছুদিন পরেই বিকল হয়ে যায়। পরবর্তীতে ২২ জুলাই ২০১৯ চন্দ্রযান-২ মিশন চালু করা হয়েছিল। প্রায় ২ মাস পরে বিক্রম ল্যান্ডার, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। সেই থেকে ভারত চন্দ্রযান-৩ মিশনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। গত ১৪ জুলাই সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দেয় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র চন্দ্রযান-৩। পূর্ব ঘোষণা মতোই শুক্রবার শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ান স্পেস সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে ঠিক দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে চন্দ্রযান-৩ এর সফল উৎক্ষেপণ হয়।

রোভার প্রজ্ঞানের চাঁদের মাটিতে নামার ভিডিয়ো পাঠিয়েছে চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডার বিক্রম। পরিকল্পনা অনুযায়ী বুধবার সন্ধ্যায় প্রজ্ঞান চাঁদের মাটি স্পর্শ করে। ছয় চাকাযুক্ত রোভার প্রজ্ঞান যখন চাঁদে নামছে তখন তার গায়ে সোনারঙা রোদ যেন ঠিকরে পড়ছে। সেই আলোতে প্রজ্ঞানের ছায়া পড়ছে চাঁদের বুকে। এ দৃশ্য কোটি কোটি উৎসুক মানুষের প্রাণে প্রশান্তি এনে দিয়েছে। চন্দ্র বিজয়ের সফলতার কথা বলতে হলে বলতে হবে ভারত সরকারের প্রচেষ্টার কথা। বিজ্ঞান ও গবেষণাক্ষেত্রে ভারত প্রায় ৭০ বছরে যথেষ্ট বিনিয়োগ করেছে। এত বছরের বিনিয়োগ ও পরিশ্রম–একবিন্দুতে মিলে এই অভিযান সফলতার মাইলফলক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ২৩ আগস্ট ২০২৩ সালের ভারতের চন্দ্রযান-৩ এর চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ স্থানের নাম দেওয়া হয়েছে শিবশক্তি পয়েন্ট।

# চাঁদের দক্ষিণ মেরু জয় করল ভারতের বিক্রম

**সন্দীপন ধর**

প্রচ্ছদরচনা

গত কয়েকদিন ধরে বাজার, অফিস, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র এই মিশনের পর্যালোচনা চলছিল। পত্রিকার পাতায় প্রায় প্রতিদিন চন্দ্রযান-৩ নিয়ে নিত্যনতুন খবর দেখে উত্তেজনার পারদ আরও বাড়ছিল। 'রকেট সায়েন্স' থেকে শুরু করে স্যাটেলাইট বানানোর পদ্ধতি, ল্যান্ডিংয়ের সময়, অভিযানের বাজেট ইত্যাদি নানা টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে এত বেশি আলোচনা হচ্ছিল যে সাধারণ মানুষও এসব কঠিন বিষয়ে আগ্রহ দেখাতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ২০১৯-এ চন্দ্রযান-২ অবতরণের সময় সাধারণ মানুষদের মধ্যে যে ক্রেজ ছিল এবার তা অনেকটাই বেশি। উত্তেজনার মাত্রা আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায় যখন চলতি মাসের ১১ আগস্ট উল্কার মতো রাশিয়ার 'লুনা-২৫' মিশনের আগমন ঘটে। এক অপ্রত্যাশিত প্রতিযোগিতার কথাই তখন সবাই ভাবছিলেন। কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গত ১৯ আগস্ট লুনা-২৫-এর ল্যান্ডার চাঁদের মাটিতে ক্রাশ ল্যান্ডিং করে। বিজ্ঞানী মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে

বিক্রম ল্যান্ডারের সফল অবতরণ আমাদের চোখে আবার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে জীবনে সাফল্য পেতে হলে গতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। চন্দ্রযান-২ -এ সবকিছু ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু ল্যান্ডার অবতরণের সময় শেষ মুহূর্তে যানের গতি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় আর তাই সেটি চাঁদের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে। সফট ল্যান্ডিং ব্যর্থ হয়। রাশিয়ার লুনা-২৫ চন্দ্র অভিযানেও ঠিক তেমনটা হয়েছিল। গতির রাশ নিয়ন্ত্রণে না রাখার জন্য রাশিয়ার মহাকাশ সংস্থা রসকসমসের মিশনও গত ১৯ আগস্ট অসফল হয়। চন্দ্রযান-২ থেকে শিক্ষা নিলে হয়তো সেই অঘটন ঘটত না।

'প্রজ্ঞান' রোভার ইতোমধ্যেই বিক্রম ল্যান্ডারের পেট থেকে একাধিক বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। রোভারে রয়েছে ছয়টি চাকা যা চন্দ্রপৃষ্ঠে ঘুরে-ফিরে বেড়াবে আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চাঁদের ভূমিরূপ কীভাবে তৈরি হয়েছে, কোন কোন উপাদান দিয়ে চাঁদের মাটি তৈরি, তা খতিয়ে দেখে ইসরোর কন্ট্রোলরুমে বার্তা পাঠাবে প্রজ্ঞান। মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য সক্রিয় থাকবে প্রজ্ঞান রোভার। কারণ এক চান্দ্র দিনে (পৃথিবীর হিসেবে ১৪ দিন) সৌর প্যানেল কাজ করবে, তারপর অন্ধকার নেমে আসবে সেই অঞ্চলে। রোভারের যন্ত্রপাতি তখন কাজ করবে না। রোভারটি বিপদ শনাক্তকরণ এবং তা এড়িয়ে চলার ব্যবস্থা দিয়ে সজ্জিত।

চাঁদের বিপদসংকুল অঞ্চল দক্ষিণ মেরুতেই কেন চন্দ্রযান মিশনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল? আসলে চাঁদের দক্ষিণ মেরু নিয়ে বিজ্ঞানীদের তথ্যের ভাণ্ডার সীমিত। চাঁদের দক্ষিণ মেরু নিয়ে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ বেশ পুরনো। ওই অঞ্চলের রহস্য উন্মোচন করার জন্যই ইসরোর এই চন্দ্র অভিযান। চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধ পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান নয়, আর অনেকটা অংশই চির অন্ধকারে ঢাকা থাকে। কারণ সূর্যের আলো সেখানে পৌঁছাতে পারে না। তাপমাত্রা নেমে যায় প্রায় শূন্যের ২৩০ ডিগ্রি নীচে। এই অসম্ভব ঠাণ্ডার জন্য ল্যান্ডারের যন্ত্রপাতি চালনা করাও বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া সেই অঞ্চলে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় গহ্বর। সবকিছু মিলিয়ে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অভিযান করা বেশ চ্যালেঞ্জিং! চন্দ্রযান-২ অবতরণের সময় পত্রিকা বা নিউজ চ্যানেলে এই বিষয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল। চাঁদের বিষুব অঞ্চলে অর্থাৎ ইকুয়েটরের আশপাশে ল্যান্ডিং-এ ঝুঁকি অনেকটাই কম। আর ইতোমধ্যে সেখানে আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীন সফলভাবে ল্যান্ডার অবতরণ করাতে পেরেছে। চাঁদে যদি বায়ুমণ্ডল থাকত তবে প্যারাসুট ব্যবহার করে সফলভাবে ল্যান্ডিং করাতে কোনো ঝামেলা ছিল না। কিন্তু বায়ুমণ্ডল না থাকার কারণে চ্যালেঞ্জ অনেকটাই বেশি। ওই অঞ্চলের রহস্য উন্মোচন করার জন্যই ইসরোর এই চন্দ্র অভিযান। এছাড়া রয়েছে ধুলোর ঝড়। ল্যান্ডিংয়ের পর ধুলোর দাপাদাপি শান্ত হবার পর বিক্রম ল্যান্ডারকে কাজ শুরু করতে হবে। নাহলে ধুলোর কারণে ইলেকট্রনিক যন্ত্র ঠিকঠাক কাজ করতে পারবে না। ল্যান্ডিংয়ের কিছুক্ষণ পর বিক্রমের পেট থেকে একাধিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে আসবে 'প্রজ্ঞান' রোভার। রোভারে রয়েছে ছয়টি চাকা যা চন্দ্রপৃষ্ঠে ঘুরে ফিরে বেড়াবে আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবে। লাখ লাখ বছর ধরে চাঁদের ভূমিরূপ কীভাবে তৈরি হয়েছে, কোন কোন উপাদান দিয়ে চাঁদের মাটি তৈরি, তা খতিয়ে দেখে বার্তা পাঠাবে 'প্রজ্ঞান'। মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য সক্রিয় থাকবে প্রজ্ঞান রোভার। কারণ এক চান্দ্র দিনে (পৃথিবীর হিসেবে ১৪ দিন) সৌর প্যানেল কাজ করবে, তারপর অন্ধকার নেমে আসবে সেই অঞ্চলে। রোভারের যন্ত্রপাতি তখন কাজ করবে না। তবে আবার সেটিকে জাগিয়ে তোলা হবে কিনা এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু ইসরোর তরফ থেকে জানা যায়নি। তবে ভারত প্রথম দেশ হিসেবে এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে।

মহাকাশ বিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে বহির্বিশ্বের দিকে যাবার আগ্রহ মানুষের তত বাড়ছে। পৃথিবীর সব থেকে কাছে রয়েছে চাঁদ। তো সেখানে মানবকলোনি গড়তে হলে প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করতে হবে। যদি চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণে বরফের সন্ধান পাওয়া যায় তবে আগামীতে চাঁদের কলোনিতে মানুষ যখন থাকবে তখন জলের অভাব হবে না। পাশাপাশি জলের অণুকে ভেঙে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করা যেতে পারে। হাইড্রোজেন গ্যাস কাজে লাগবে রকেটের ইন্ধন হিসেবে, আর অক্সিজেন মহাকাশচারীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে আগামীতে অন্য নিকটবর্তী গ্রহে মহাকাশচারীদের যেতে সুবিধা হবে। চাঁদের কলোনি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ইন্ধন আর জল নিয়ে মঙ্গল বা অন্য গ্রহ ভ্রমণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। আপাতত ইসরোর বিজ্ঞানীরা চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের গহবরে জমাট অবস্থায় থাকা জল তথা অন্যান্য খনিজ পদার্থ অধ্যয়ন করে চাঁদের আগ্নেয়গিরি, সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে নিত্যনতুন তথ্য জানতে পারবেন।

এবার তাহলে জেনে নেওয়া যাক চন্দ্রযান-৩ এর ইতিকথা। চন্দ্রযান-৩ হলো ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ভারতের চন্দ্রাভিযান কর্মসূচির অন্তর্গত তৃতীয় চন্দ্রান্বেষণ অভিযান ও চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম অবতরণ। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো চন্দ্রপৃষ্ঠে নিরাপদ ও সুরক্ষিত অবতরণ, রোভারের নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানোর সক্ষমতা যাচাই এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদনা করা। চন্দ্রযান-৩ এর অবতরণস্থল হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুকে বেছে নেওয়া হয়। এর কারণ হলো ইসরোর বিজ্ঞানীগণ আশা করেছিলেন যে, এর দক্ষিণ মেরু থেকে চাঁদ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হবে।

পূর্ববর্তী চন্দ্রযান-২ একটি অরবিটারকে সফলভাবে চাঁদের কক্ষপথে স্থাপন করেছিল, কিন্তু ল্যান্ডারের সফট ল্যান্ডিংয়ের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। এই ঘটনার পরে, সফট ল্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে চাঁদে অবতরণের জন্য ইসরো 'চন্দ্রযান-৩' আরও একটি চন্দ্র অভিযানের কর্মসূচি শুরু করে। [১০]

অভিযানে প্রোপালশন মডিউল, ল্যান্ডার (বিক্রম) ও রোভার (প্রজ্ঞান) ব্যবহৃত হয়েছে, তবে কোনো কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরিত হয়নি। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের শ্রীহরিকোটায় অবস্থিত সতীশ ধওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ২০২৩ সালের ১৪ জুলাই চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযানের সফল উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

উৎক্ষেপণের ৯৬৯.৪২ সেকেন্ড পরে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ১৭৯.১৯২ কিমি উচ্চতায় উপগ্রহ পৃথকীকরণ ঘটে এবং মহাকাশযানটি পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয়। মহাকাশযানটি পৃথক পৃথক পাঁচটি কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার পরে ১ আগস্ট 'ট্রান্সলুনার ইঞ্জেকশন'-এর মধ্যমে পৃথিবীর আকর্ষণের বাধা কাটিয়ে চাঁদের পথে যাত্রা শুরু করেছিল। এটি ৫ আগস্ট সফলভাবে ১৬৪ কিমি ১৮,০৭৪ কিমি পরিমাপের চন্দ্র কক্ষপথে প্রবেশ করেছিল। মহাকাশযানটি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের আগে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে, এবং পঞ্চম প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করার পরে ল্যান্ডার থেকে প্রপালশান মডিউল পৃথক হয়ে যায়।

চন্দ্রযান-৩ ২০২৩ সালের ২৩ আগস্ট চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে অবতরণ করে। অভিযানের মাধ্যমে পূর্বসূরি ইউএসএসআর, নাসা ও সিএনএসএ-এর পরে ইসরো চাঁদে সুরক্ষিত অবতরণে সক্ষম চতুর্থ মহাকাশ সংস্থায় পরিণত হয়।

চাঁদের পৃষ্ঠে সফট ল্যান্ডিংয়ের জন্য চন্দ্রযান কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্বে ইসরো উৎক্ষেপক যান মার্ক-৩ রকেটের দ্বারা একটি অরবিটার, ল্যান্ডার ও রোভারের সমন্বয়ে গঠিত চন্দ্রযান-২কে ২০১৯ সালের ২২ জুলাই উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। রোভার প্রজ্ঞানকে চন্দ্রপৃষ্ঠে স্থাপন করা জন্য ল্যান্ডারটির ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করার কথা ছিল। ল্যান্ডারটি পৃথিবীর (ইসরো) সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ও অবতরণের চেষ্টা করার সময় তার অভিপ্রেত গতিপথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়েছিল। চন্দ্রযান-২ বিধ্বস্ত হওয়ার পরে, একই উদ্দেশ্য নিয়ে ইসরো চন্দ্রযান-৩-এর কার্যক্রম শুরু করেছিল।

ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ইএসএ) দ্বারা পরিচালিত ইউরোপিয়ান স্পেস ট্র্যাকিং নেটওয়ার্ক অভিযানটিকে সমর্থন করেছিল। একটি নতুন পারস্পরিক-সমর্থন ব্যবস্থার অধীনে, ইএসএ ট্র্যাকিং সমর্থন আসন্ন ইসরো অভিযানগুলোর জন্য প্রদান করা যেতে পারে। যেমন : ভারতের প্রথম মানব মহাকাশযান কর্মসূচি, গগনযান ও সৌর গবেষণা অভিযান আদিত্য-এল-১, বিনিময়ে ইএসএ কর্তৃক ভবিষ্যতে পরিচালিত অভিযানগুলো ইসরো-এর নিজস্ব ট্র্যাকিং স্টেশনগুলো থেকে অনুরূপ সমর্থন পাবে।

চন্দ্রযান-৩-এর সম্ভাব্য অবতরণ স্থলগুলোর জন্য কঠোর মানদণ্ড ছিল, যেখানে বৈজ্ঞানিক আগ্রহ একটি প্রধান কারণ ছিল : স্থানগুলোকে চন্দ্র দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের মধ্যে থাকতে হয়েছিল, পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান চন্দ্রপৃষ্ঠের অংশের পরিধিগুলোতে নয়; এগুলোকে তুলনামূলকভাবে সমতল হতে হয়েছিল এবং ল্যান্ডার অবতরণ স্থলের কাছে পৌঁছালে স্থানগুলো থেকে উড়ে আসতে না পারে এমন কোনো প্রকার বস্তুর অনুপস্থিতি ল্যাংমুয়ার প্রোব (এলপি) দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

চন্দ্রযান-২-এর অরবিটারের অরবিটার হাই-রেজোলিউশন ক্যামেরা (ওএইচআরসি) দ্বারা পূর্বে ধারণকৃত চিত্রগুলোর ওপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট ৪ কিমি (২.৫ মাইল) বাই ৪ কিমি (২.৫ মাইল) পরিমাপের অবতরণক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছিল।

চন্দ্রযান-৩-এর উৎক্ষেপণের জন্য এলভিএম৩-এম-৪ রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল, যার ওজন ৬,৪২,০০০ কেজি ও উচ্চতা ৪৩.৫ মিটার ছিল। এটি উৎক্ষেপণের সময়ে মহাকাশযানে ওজন ৩,৯০০ কেজি ছিল, চন্দ্রযান-২-এর ওজন ৩,৮৫০ কেজি অপেক্ষা বেশি।

রকেটের মূল উপাদানগুলো হলো এস-২০০ সলিড রকেট বুস্টার, এল-১১০ তরল পর্যায় ও সি-২৫ ক্রায়োজেনিক পর্যায়। রকেটের সঙ্গে ৩.২ মিটার (১০ ফুট) চওড়া, ২৬.২২ মিটার লম্বা ২ টি এস-২০০ যুক্ত ছিল, এবং এগুলো জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোক্সিল-টার্মিনেটেড পলিবুটাডিয়ানভিত্তিক প্রোপেল্যান্ট তিনটি অংশে বহন করেছিল। ২টি বিকাশ ২ ইঞ্জিন দ্বারা চালিত এল-১১০ পর্যায়টি ২১.৪ মিটার লম্বা ও ৪ মিটার (১৩ ফুট) চওড়া এবং এটি জ্বালানি হিসেবে অপ্রতিসম ডাইমিথাইলহাইড্রাজিন ও নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড ব্যবহার করেছিল। ক্রায়োজেনিক পর্যায়ের (সি-২৫) সঙ্গে মহাকাশযানটি সংযুক্ত ছিল। এই পর্যায়টি ৪ মিটার (১৩ ফুট) ব্যাস বিশিষ্ট এবং ১৩.৫ মিটার (৪৪ ফুট) লম্বা ছিল।

চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযানটি প্রপালশান মডিউল, ল্যান্ডার (বিক্রম) ও রোভার নিয়ে গঠিত ছিল। প্রপালশান মডিউলে একটি থ্রাস্টার রয়েছে, যা লুনার মডিউলকে (ল্যান্ডার ও রোভার) সি-২৫ ক্রায়োজেনিক পর্যায় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে বহন করেছিল। শঙ্কু আকৃতির আন্তঃমডিউল অ্যাডাপ্টার প্রপালশান মডিউল ও লুনার মডিউলের মধ্যে কাঠামোগত সংযোগ প্রদান করে।

ল্যান্ডার 'বিক্রম'-এর চারটি তির্যক পা ও চারটি ল্যান্ডিং থ্রাস্টার (ইঞ্জিন) রয়েছে। চন্দ্রযান-২-এর তুলনায় চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডারের পা বা ইমপ্যাক্ট লেগ আরও শক্তিশালী এবং যন্ত্রের অপ্রয়োজনীয়তা আতিশয্য উন্নত করা হয়েছিল। এটির সঙ্গে মোট তিনটি পেলোড সংযুক্ত রয়েছে, যেগুলো হলো রম্ভা (রেডিয়ো অ্যানাটমি অফ মুন বাউন্ড হাইপারসেন্সিটিভ আয়নোস্ফিয়ার অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ার), চ্যাস্টে (লুনার'স সারফেস থার্মোফিজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট) ও ইলসা (ইনস্ট্রুমেন্ট ফর লুনার সিসমিক অ্যাক্টিভিটি)। নাসার তৈরি একটি প্যাসিভ লেজার রেট্রোরিফ্লেক্টর অ্যারে ল্যান্ডারে স্থাপন করা হয়েছিল, যেটি চাঁদে লেজার রেঞ্জিং অধ্যয়নে নিয়োজিত ছিল। অ্যারে (লেজার রেট্রোরিফ্লেক্টর)। ল্যান্ডারে তির্যকভাবে সংযুক্ত রয়েছে সোলার প্যানেল, যা সৌরশক্তি ব্যবহার করে ৭৩৮ ওয়াট শক্তি উৎপন্ন করতে সক্ষম। ল্যান্ডারের এক পাশে রোভারটি একটি র‍্যাম্পসহ যুক্ত করা হয়েছিল। ইসরো ল্যান্ডারের কাঠামোগত দৃঢ়তা উন্নত করেছিল,

যন্ত্রগুলোতে পোলিং বৃদ্ধি করেছিল, ডেটা ফ্রিকোয়েন্সি ও ট্রান্সমিশন বৃদ্ধি করেছিল এবং অবতরণ ও অবতরণের সময় ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ল্যান্ডারের টিকে থাকার ক্ষমতা উন্নত করার জন্য অতিরিক্ত একাধিক কন্টিনজেন্সি ব্যবস্থা সংযুক্ত করেছিল।

২৬ কেজি ওজনের রোভারটি ৬টি চাকাযুক্ত। রোভার পরিচালনার জন্য রোভারের সঙ্গে সংযুক্ত ৫০ ওয়াটের একটি সৌর প্যানেল থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করা হয়েছিল। আলফা পার্টিকেল এক্সরে স্পেকট্রোমিটার (এপিএক্সএস) ও লেজার ইনডিউসড ব্রেকডাউন স্পেকট্রোস্কোপ (এলআইবিএস) নামের দুটি পেলোড রোভারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল।

চন্দ্রযান-৩ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ জুলাই ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের শ্রীহরিকোটায় অবস্থিত সতীশ ধাওয়ান মহাকাশকেন্দ্র থেকে ভারতীয় সময় ২টা ৩৫ মিনিটে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। দুটি এস-২০০ রকেট বুস্টারের কঠিন জ্বালানি ১২৭ সেকেন্ড ধরে জ্বলে, এবং ৬২.১৭১ কিমি উচ্চতায় বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। উৎক্ষেপণের ১০৮ সেকেন্ডের মধ্যে এল-১১০ তরল জ্বালানি পর্যায়টি জ্বলতে শুরু করেছিল, এটি ২০৩ সেকেন্ড ধরে রকেটটি চালনা করেছিল। সি-২৫ ক্রায়োজেনিক পর্যায়টি ৩০৭.৯৬ সেকেন্ডে ১৭৬.৫৭৩ কিমি উচ্চতায় চালু হয়েছিল, এবং মহাকাশযানটি ৯৬৯.৪২ সেকেন্ডে ১৭৯.১৯২ কিমি উচ্চতায় রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন ও সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছিল।

চাঁদের পথে যাত্রা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় গতি অর্জনের জন্য মহাকাশযানটি পৃথিবীকে পাঁচটি ভিন্নভিন্ন পরিমাপের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করেছিল। কক্ষপথ উত্থাপনের কৌশলের (পৃথিবী-বাউন্ড পেরিজি ফায়ারিং) মধ্যমে মহাকাশযানকে একটি কক্ষপথ থেকে পরবর্তী কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছিল, এই প্রক্রিয়া মোট ৪ বার প্রয়োগ করা হয়েছিল। আরও একটি কক্ষপথ উত্থাপন কৌশল ২৫ জুলাই চালু করা হয়েছিল।

প্রপালশান মডিউল দ্বারা ট্রান্স-লুনার ইনজেকশন বার্নটি ২০২৩ সালের ৩১ জুলাই শুরু হয়েছিল, এবং মহাকাশযানকে ১ আগস্ট ট্রান্সলুনার ইনজেকশনের মাধ্যমে ২৮৮ কিমি ৩,৬৯,৩২৮ কিমি পরিমাপের ট্রান্সলুনার কক্ষপথ স্থাপন করা হয়েছিল, যা মহাকাশ যানটিকে চাঁদের দিকে নিয়ে যায়।

চন্দ্রযান-৩ ২০২৩ সালের ৫ আগস্ট ১,৮৩৫ সেকেন্ডের প্রচেষ্টায় চাঁদের ১৬৪ কিমি X ১৮০৭৪ কিমি কক্ষপথে প্রবেশ করে। [২২] পঞ্চম চন্দ্র কক্ষপথে, মহাকাশযানের কক্ষপথকে ১৫৩ কিমি বাই ১৬৩ কিমি পরিমাপে বৃত্তাকার করার জন্য ১৬ই আগস্ট আরেকটি বার্ন হয়েছিল এবং পরবর্তী ধাপে প্রপালশান মডিউল পৃথক করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। ল্যান্ডার মডিউলকে সফলভাবে প্রপালশন মডিউল থেকে ১৭ আগস্ট আলাদা করা হয়েছিল। ল্যান্ডার মডিউলের গতিকমানোর জন্য প্রথম ডিবুস্টিং ১৮ আগস্ট চালু করা হয়েছিল, এবং ১৯ আগস্ট ১১৩ কিমি বাই ১৫৭ কিমি পরিমাপের কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয় ডিবুস্টিং ২০ আগস্ট চালু করা হয়েছিল, এবং ল্যান্ডার মডিউলটি ১১৩ কিমি বাই ১৫৭ কিমি পরিমাপের কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছিল।

ল্যান্ডার বিক্রম তার কক্ষপথের নিম্ন বিন্দুর কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে ২৩ আগস্ট সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটে ব্রেকিং কৌশলের সঙ্গে চারটি ইঞ্জিন চালু ও অবতরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল; এই সময়ে ল্যান্ডার চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে ৩০ কিলোমিটার উচ্চতায় ছিল। অবতরণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমের গতি ১,১৫০ মিটার প্রতি সেকেন্ডে কমিয়ে আনা হয়েছিল, এই সময়ে বিক্রম অবতরণ স্থল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরত্বে ছিল। রাফ ব্রেকিং প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ১১.৫ মিনিট পরে চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে ল্যান্ডার ৩০ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে ৭.২ কিলোমিটার করা হয়েছিল, এই উচ্চতা প্রায় ১০ সেকেন্ডের জন্য বজায় রাখা হয়েছিল। তারপর আটটি ছোট থ্রাস্টার ব্যবহার করে ল্যান্ডার বিক্রম নিজেকে স্থিতিশীল করে এবং অবতরণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আনুভূমিক অবস্থান থেকে একটি উলম্ব অবস্থানে ঘোরানো হয়েছিল। তারপরে এটি তার চারটি ইঞ্জিনের মধ্যে দুটি ব্যবহার করে প্রায় ১৫০ মিটার (৪৯০ ফুট) উচ্চতায় পৌঁছেছিল; এটি সেখানে প্রায় ৩০ সেকেন্ডের জন্য ঘোরাফেরা করে।

ল্যান্ডার বিক্রম সন্ধ্যা ৬টা ২ মিনিটে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে অবতরণ করে, চূড়ান্ত পর্যায়ের এই অবতরণ প্রক্রিয়া ১৯ মিনিট ধরে চলেছিল। অবতরণ স্থলের চন্দ্র স্থানাঙ্ক ছিল ৬৯.৩৬৭৬২১° দক্ষিণ অক্ষাংশ ও ৩২.৩৪৮১২৬° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

১০০ কিমি বাই ১০০ কিমি পরিমাপের কক্ষপথে স্থাপনের পরে প্রপালশান মডিউল ৩ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনা করবে। ল্যান্ডার ও রোভার ১৪ দিন বা ১ চন্দ্র দিবস সমকাল পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে, এবং নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পাদনা করবে। এই দীর্ঘ সময়টা ইসরোর পক্ষ থেকে যারা নেতৃত্ব দেবেন তারা হলেন ইসরোর চেয়ারম্যান : এস. সোমানাথ; মিশন পরিচালক : এস. মোহনকুমার; মিশন সহযোগী পরিচালক: জি. নারায়ণন; প্রকল্প পরিচালক : পি. ভিরামুথুভেল; উপ-প্রকল্প পরিচালক : কল্পনা কলহস্তি; যানবাহন পরিচালক : বিজু সি. টমাস এছাড়াও ইসরোর বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ সকল।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে, ইসরো প্রকল্পটির প্রাথমিক অর্থায়নের জন্য অনুরোধ করে, যার পরিমাণ ₹৭৫ কোটি। এর মধ্যে মধ্যে ₹৬০ কোটি যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য এবং বাকি ₹১৫ কোটি রাজস্ব ব্যয়ের জন্য চাওয়া হয়।

প্রকল্পের অস্তিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করে ইসরো সভাপতি কে. সিভান জানান যে অভিযানে প্রায় ₹৬১৫ কোটির কাছাকাছি ব্যয় হবে।

প্রাপ্ত খবর মতে 'বিক্রমল্যান্ডার' ঠিকঠাক কাজ করছে। এবার 'প্রজ্ঞান' রোভার জাগবে! শুরু হবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আগামী দিনে অনেক নতুন তথ্য নিয়ে হাজির হবে 'প্রজ্ঞান'। সেই আশায় প্রহর গুনছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করবে 'প্রজ্ঞান'। অবশেষে বলতে হয়, গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে ইসরো নতুন গতিশক্তি পেয়েছে যা আগামীতে ভারতকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে সাহায্য করবে। এভাবেই বিজ্ঞান এগিয়ে যাবে। •

**সন্দীপন ধর**
জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষক IUCCA, পুনে।
বিজ্ঞান সঞ্চারক ও একজন বিজ্ঞান লেখক।

স্বাধীনতা দিবস

# রাঙাও ভারত বাসন্তী রঙে

পীযূষকান্তি বিশ্বাস

‘জন্মিলে মরিতে হবে রে, জানে তো সবাই/ তবু মরণে মরণে অনেক ফারাক আছে ভাই/ সব, মরণ নয় সমান...’ এই আমাদের নিয়তি, এই মরণ আমাদের ভবিতব্য। সর্বধর্মজাতিদেশ নির্বিশেষে এই আমাদের ধ্রুব পরিণতি। যেভাবে, মাতৃ-জঠরে কুঁড়ির মতো ফুটেছি, ক্রমে পূর্ণ-পুষ্পে প্রস্ফুটিত হয়েছি। সেভাবেই ঝরে পড়া নক্ষত্রের মতো কোনোদিন হিমের পরশে মিশে যাব। ঝরে তো যাব সবাই, তবে যদি ঝরা যায় নিজের ভূমিকায়, যদি মরা যায় নিজের স্বাধীনতায়।

যদি মরে যেতে পারি মনুষ্য কল্যাণে আত্মত্যাগে নিজস্ব মরণে, সেই মরণ হয় মহান, সেই মৃত্যু হয় আকাশ সমান গৌরবের। এমনই এক গৌরবের গল্প করি আজ। মরণকে বাজি রেখে পরাধীনতা থেকে ভারতবর্ষকে আজাদ হবার কাহিনি।

রক্তকে আবির করে ভারতভূমিকে রাঙিয়ে নেওয়া সঙ্গীত। হাড়কে হিম করে এক এক করে পার করে যাওয়া বারুদের আগুন স্রোত। যাদের আত্মত্যাগে আমরা স্বাধীন আজ। জন্ম, মৃত্যু আর বসন্ত রঙের এই অবাক পৃথিবীর নাম আজ দেওয়া যাক ‘আজাদ’।

তখন ১৯০৬ সাল হবে। আকাশে বাতাসে দুর্ভিক্ষের বাতাবরণ! ভারতীয় উপমহাদেশকে লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে গ্রেট ব্রিটেন। ব্রিটিশসাম্রাজ্যে যখন সূর্য ডোবে না তখন। আর এদিকে দুর্ভিক্ষের অন্তরালে ব্রিটিশ বাহিনী হামলে পড়েছে বঙ্গ বক্ষে, রাজপুতনায়, মহারাষ্ট্রে, মধ্যপ্রদেশে। তাদের বাণিজ্য সাফল্যের জন্য দেশীয় কৃষকদের কখনো বাধ্য করলেন নীল চাষ করার জন্য, কখনো তাদের ফসলের খাজনা দ্বিগুণ করে করেন উৎপীড়ন।

পরাধীনতার অঙ্কুশে ভারতমাতা কেঁদে কেঁদে উঠছে ভারত। আকাশ বাতাসে ক্রন্দন ধ্বনির আওয়াজ। মা, একটু ফ্যান দেবেন? যখন ইংরাজের বিধ্বংসী বন্দুকের সামনে নতজানু পরাধীন ভারতের কৃষক, কুমার, তেলী, ব্রাহ্মণ, সমগ্র ভারতবাসী। ঘরে ঘরে আতংকের পরিবেশ ছেয়ে আছে। মধ্যপ্রদেশের ভাভরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন চন্দ্রশেখর তিওয়ারি। চন্দ্রশেখর স্থানীয় ভীল আদিবাসী শিশুদের সাথে বেড়ে উঠতে থাকেন। খেলাধুলায় চোস্ত। সুঠাম শরীর তার। তাঁর মা তাঁকে সংস্কৃত পণ্ডিত করার স্বপ্ন দেখতেন এবং তাঁকে বেনারসের কাশী বিদ্যাপীঠে পাঠালেন।

ছেলের পড়াশোনায় যতটা মন, ততটাই তিনি জাতীয়তাবাদের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েন। তখন দেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের তুঙ্গে। স্বদেশী আন্দোলন রূপ ছড়িয়ে পড়েছে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে। মহাত্মা গান্ধী তখন পরাধীন ভারতের প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতা। চন্দ্রশেখরের ইচ্ছে, তিনি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবেন। কৈশোর থেকে যুবক বয়সে পা দিতে না দিতেই চন্দ্রশেখর ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেফতার হয়ে খুশি খুশি কারাবরণ করেন। ১৯২২ সালে যখন মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন, কিশোর চন্দ্রশেখরের জাতীয়তাবাদী মনোভাব এবং তাঁর দেশকে স্বাধীন দেখার স্বপ্নে একটি বড়সড় আঘাত পান। চন্দ্রশেখর আন্দোলন প্রত্যাহারের পক্ষে ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ধরনের অহিংস আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভগুলোকে নাড়া দেবে না।

শুরু হলো, আত্ম উপলব্ধির পালা। কি করা যায়। গ্রামবাসী কৃষকদের অবস্থানের কথা তাকে খুব ভাবাত। চন্দ্রশেখর বুঝতে পারেন এই দরিদ্রদের ভাষা ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝতে নারাজ। জালিয়ানবালা হত্যাকাণ্ডে তারা নিরস্ত্র এবং নিরপরাধ ব্যক্তিদের ভিড়ের ওপর সহিংস গুলিবর্ষণের ঘটনা তাঁকে আহত ছিন্নভিন্ন করে তুলেছিল। ব্রিটিশদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ভরসা রাখতে পারছিলেন না। আলোচনা আসলে হয় সেয়ানে সেয়ানে। সাম্রাজ্যবাদী আর দরিদ্র-কৃষকদের আলোচনা সমান হতে পারে না। স্বদেশী আন্দোলনের সার বুঝতে পেরে তার চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। পেশিতে প্রকাণ্ড হস্তির শক্তি অনুভূত হয়। শিরায় শিরায় রক্তে বুঝতে পারেন বয়ে যাওয়া দুরন্ত নর্মদা নদীর স্রোত। চন্দ্রশেখর নিজেকে 'বলরাজ' হিসেবে ঘোষণা দেন। কোনো অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে ব্রিটিশের সঙ্গে আলোচনা আর নয়, আলোচনা হবে শক্তিতে শক্তিতে।

নিজেকে দীক্ষিত করে তোলেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে। শক্তি অর্জন করতে হবে। শক্ত হাতে, সাম্রাজ্যবাদীদের শিক্ষা দিতে হবে। গড়ে উঠল হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের (এইচআরএ)। যা ছিল একটি জঙ্গি সংগঠন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সহিংসতা ব্যবহারে বিশ্বাসী সংগঠন। শুরু করলেন অস্ত্র সংগ্রহ ও লোকবল জোগাড় করা। পরিকল্পনা হলো অস্ত্র সংগ্রহের জন্য সরকারি ট্রেন লুট। ১৯২৫ সাল নাগাদ কাকোরি ট্রেনে করা হলো বোমা হামলা। একজন যাত্রী সেই অভিযানে মারা যান। ব্রিটিশরা এটিকে হত্যা বলে অভিহিত করে। মামলা দায়ের করেন। তার সঙ্গীসাথি আশফাকুল্লা খানের সাথে বিসমিলকে গ্রেফতার করা হয়, তবে চন্দ্রশেখর নিজে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

চন্দ্রশেখর ছিলেন বিচক্ষণ এবং ক্রমে হয়ে উঠলেন দেশব্যাপী আন্দোলনের অংশীদার। এরপর তিনি এইচআরএর সদর দফতর কানপুরে চলে আসেন। সেই সময়ের সবচেয়ে ভয় পাওয়া স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দ্রশেখর। সেবছর ব্রিটিশ পুলিশের লাঠিচার্জে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা লাজপত রায় মারা যান। সেই কারণে, চন্দ্রশেখর তিনি জেমস স্কটকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। বিপ্লবী ভূমিকায় উত্তর ভারতে চন্দ্রশেখর তিওয়ারী ক্রমে হয়ে উঠলেন চন্দ্রশেখর 'আজাদ'। এইরকম এক সাহসী অভিযানে একদিন তার সংস্পর্শে এলেন প্রথমবার ভগৎ সিং ও রাজগুরুসহ অন্যান্য তরুণ বিপ্লবীরা। চন্দ্রশেখর আজাদের সত্য দেশপ্রেম, ভারতের স্বাধীনতার জন্য তার জীবন সংগ্রাম ছিলো বহু বিপ্লবীদের আদর্শ। স্বাধীনতা ও ন্যায়ের শক্তিতে বিশ্বাসী সকলের কাছে তিনি অনুপ্রেরণা। হাসিমুখে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন ভগৎ সিং। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যখন জেমস স্কটকে উচিত শিক্ষার নিয়ে প্লান করা হলো। এ এক একমুখী বিপ্লবী অভিযান যেখান থেকে গৃহে ফিরে আসা সম্ভব নয়। এই কার্যে সফল হওয়ার ভাগ অনিশ্চিত, মৃত্যুর পথ অবধারিত। বিপ্লবীরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

জেমস স্কট ছিলেন লাঠিচার্জের আদেশ দাতা। ঘটনাক্রমে জেপি সন্ডার্সকে পুলিশ স্টেশন থেকে ফেরার পথেই বুলেটবিদ্ধ করেন রাজগুরু ও ভগৎ সিং। জেপি সন্ডার্সকে ৮টি ক্লোজ শটের গুলি খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। পুলিশও ভীষণ তৎপরতার সঙ্গে অধিকাংশ বিপ্লবী সদস্যদের গ্রেফতার করে ফেলল। তাদেরকে রাখা হলো দিল্লি জেল ও পরে লাহোর মিয়ানওয়ালি জেলে। কিন্তু চন্দ্রশেখর আজাদকে পুলিশ ধরতে পারল না। এ কারণেই তাকে 'কুইক সিলভার' নাম দেওয়া হয়। চন্দ্রশেখর আজাদ তার দুর্দান্ত ছদ্মবেশী ক্ষমতা ব্যবহার করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। ধরা পড়ল ভগৎ সিং ও শিবরাম রাজগুরু। বলা হলো তাদের ফাঁসি হবে। বসন্তী পঞ্চমীর দিন। বিপ্লবীরা খোলা পাঞ্জাবি স্বরে কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন মেরে রং দে বাসন্তী চোলা। এই বিপ্লবী জীবন এক পলকের জন্য রাঙিয়ে নেওয়া। এই সুন্দর পৃথিবীর আকাশ, এই সুন্দর সুবাসিত বাতাস থেকে চির বিদায় জানানোর পালা। ভারতের স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদানের মতো মরণ। সারা দেশ উত্তাল। খবরের কাগজ উত্তাল। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশের কাছে ভগৎ সিং এর প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন। আর ওদিকে, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্রিটিশপুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের। বিপ্লবীদের জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাবার পন্থা বের করছেন।

যে কোনো সময়, সরকারি পুলিশ তাকে ধরে করে ফেলতে পারে। এই তো জীবন, এই তো জিদ। চন্দ্রশেখর আজাদ অনায়াসে আজকের নেতাদের মতো সঙ্গীসাথিদের ছেড়ে নাম ভাঁড়িয়ে অন্য দলে ভিড়ে গিয়ে পালিয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন। মিশে যেতে পারতেন সাধারণ দরিদ্র নিরুপায় কৃষকদের ভিড়ে। হয়তো, চুপচাপ রাতের অন্ধকারে কোনো গ্রাম প্রান্তরে জীবন সেভাবেও শেষ করা যেত। চন্দ্রশেখর আজাদ সেই জীবন চাননি। সেই মাটির মানুষ তিনি নন। তার রক্তে সেই মরণ ছিল না।

চন্দ্রশেখর আজাদ ছিলেন ব্রিটিশ রাজের জন্য দুঃস্বপ্ন। ব্রিটিশ কর্মকর্তারা তাকে মৃত বা জীবিত ধরতে বদ্ধপরিকর। এমনকি তারা তার মাথার জন্য একটি বড় আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। এই ঘোষণার ফলে একজন ইনফর্মার চন্দ্রশেখর আজাদের হদিস খুঁজে পান। সেই খবর পেয়ে ১৯৩১ সালে, চন্দ্রশেখর আজাদকে এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে ব্রিটিশ পুলিশ কোণঠাসা করে ফেলে। তিনি সহজেই পালাতে পারতেন, কিন্তু আত্মসমর্পণ না করে তিনি মৃত্যুর সাথে লড়াই করার পথ বেছে নিলেন। বুলেটের শিলাবৃষ্টিতে ঘিরে ফেলা হলো আস্তানা। পর্যাপ্ত অস্ত্র ও কার্তুজ চন্দ্রশেখর আজাদের কাছে ছিল না। একক যুদ্ধে একটি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে কতক্ষণ আটকানো যায়? তিনি বুঝতে পারছেন গ্রেফতার অবশ্যম্ভাবী। ফাঁসির কাঠে তাকে ঝোলানো হবে।

তিনি ধরা দিতে চাইলেন না। একটি বুলেট তিনি নিজের পকেটে সর্বদা নিজের জন্য বরাদ্দ করে রাখতেন। অন্তিম মুহূর্তে তিনি নিজেই নিজের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে নিজের মৃত্যু নিজেই ঘোষণা করলেন। মরণ তে তুহু মেরে শ্যাম সমান। চন্দ্রশেখর আজাদ, আত্মঘোষণায় আজাদীর সঙ্গে অমর হয়ে গেলেন।

এহেন, বহু মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয়তাবাদীদের আত্মত্যাগে আমরা ভারতের স্বাধীনতা পেয়েছি। যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে নিরলসভাবে লড়াই করেছে তাদের ভিতর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহিদ হলেন চন্দ্রশেখর আজাদ। তিনি ছিলেন একজন প্রবল জাতীয়তাবাদী এবং ভারত মাতার প্রকৃত সন্তান। যার কোনো পরাশক্তির ভয় ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর সাহসিকতা সর্বদা স্মরণযোগ্য। তার মরণের কাছে হার মানে এই পাহাড় হিমালয়, নতশির হয়ে বসে আছে এই আসমুদ্রহিমাচল। তার ত্যাগের কাছে আমাদের এই সামান্য মুরতি, স্যালুট জানায়। ভারতীয় উপমহাদেশ যতবারই তার স্বাধীনতা উদ্‌যাপন করবে ততবারই তাঁকে স্মরণ করা হবে। তাঁর নিঃশর্ত ভালবাসা এবং নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ভারতীয় ইতিহাসে দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হবে।

পীযূষকান্তি বিশ্বাস
কবি ও প্রাবন্ধিক

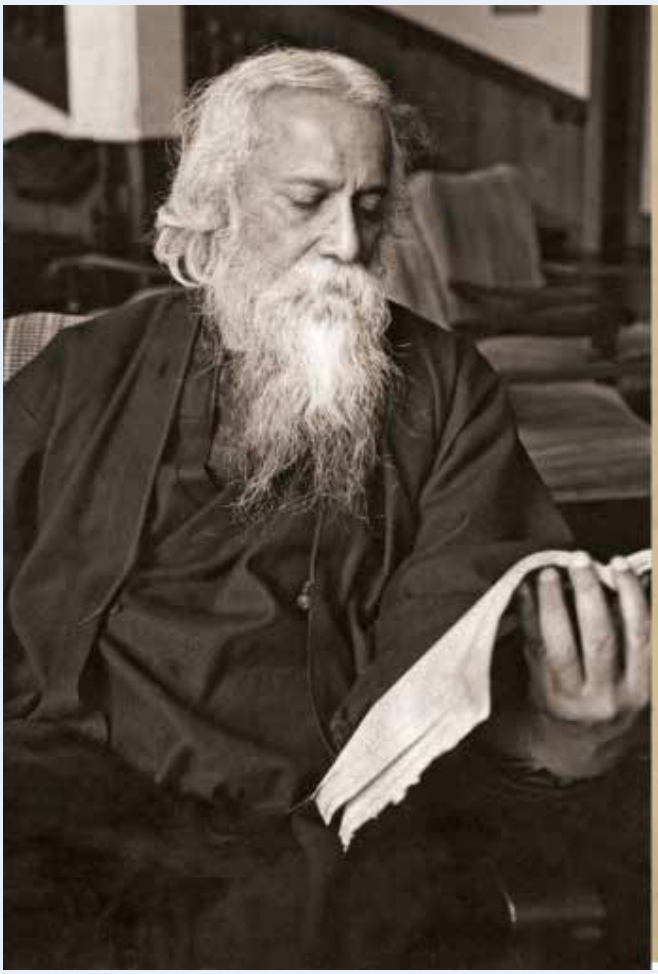

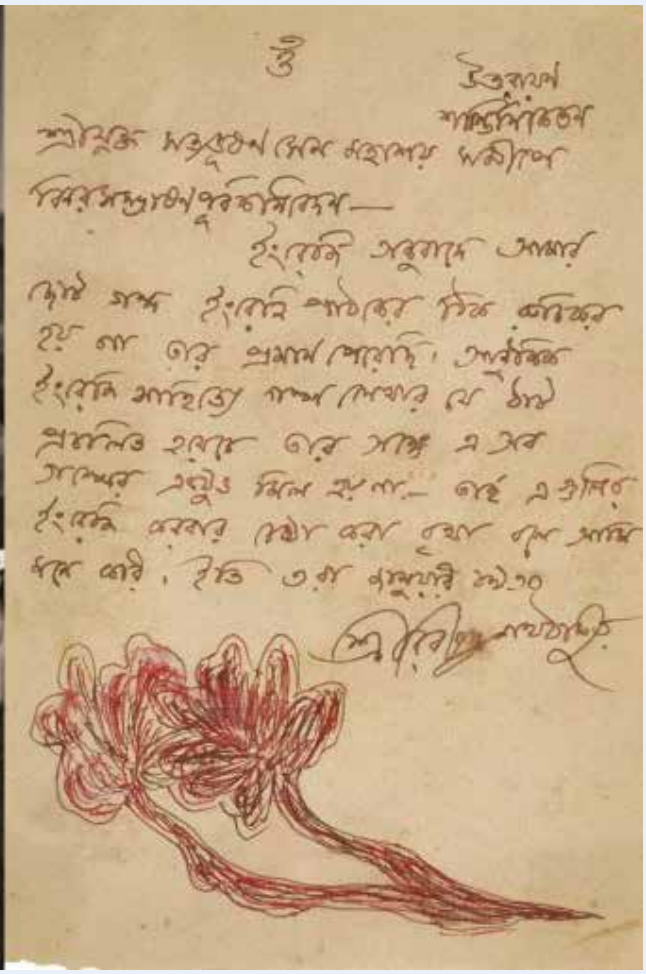

প্রবন্ধ

# চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ

দীপক লাহিড়ী

জীবনের প্রতিদিনে সংযোজক কথা বা ভাবনা যখন প্রকাশরূপ পেতে চায় তখন তা কথামালার চিত্ররূপে ধরা পড়ে যার প্রকাশ চিঠিপত্র। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে চিঠিপত্র এক সাংস্কৃতিক মাধ্যম শিল্প। 'পথে ও প্রান্তরে' ৩৭ নম্বর পত্রে তিনি লিখেছেন : 'যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানলার ধারে বসে লেখে, আলাপ করে যায়–তার ভার নেই, বেগ নেই, স্রোত আছে।' চিঠিপত্রের মধ্যে আসলে আছে এক গহন গভীর জলজ দর্পণ, মনের প্রতিচ্ছবি যাতে ধরা পড়ে। যে চিঠি লেখে আর যে তা গ্রহণ করে তারা যেন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে সেই চিঠির বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করে তোলে। মানুষের আত্মান্বেষণ ও আত্মোৎঘাটনের মাধ্যম চিঠি। যদিও আজকের মানুষের চিঠি লেখার অনীহা খুব তীব্র। ইমেল, এস.এম.এস.-এর কার্যকারিতায় ভাষা যেন তার গতিপথ হারিয়ে ফেলেছে! মানবমনের গভীরে উদ্ভূত ক্রিয়া প্রক্রিয়া নদীর মরুপথে ধারা হারানোর অবস্থায় পৌঁছেছে

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে আছে অগাধ ঐশ্বর্যের সন্ধান যেমন ইচ্ছা, প্রত্যাশা, প্রার্থনা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে দার্শনিক উপলব্ধি। বিচিত্র মানবতার উদাহরণের এক মহাসম্মিলন।

মননে বীক্ষণে রবীন্দ্র পত্রসাহিত্য এক অপরূপ সৃষ্টিকে চিহ্নিত করেছে। চিঠিপত্রের মারফত উপলব্ধির আহরণকে তাঁর অখণ্ড আপনার অনুসন্ধানই মনে হয়েছিল। তাই সেই উজ্জ্বল উদ্ধার বিশ্লেষণের মধ্যে রবীন্দ্রভাবনার একটা লক্ষ্যে পৌঁছন যেতে পারে, যার নির্দিষ্ট স্বরূপ নির্মাণ তাঁর পত্র। ইংরেজি সাহিত্যে দেখা যায় পত্র বা চিঠিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি 'Epistles' অন্যটি 'Letters'। Encyclopedia Britannica -তে বলা হয়েছে :

'A broad distinction exits between the letter and epistole. The letter is essentially a spontaneous non literary production, personal and private, a substitute for spoken conversation.'

অর্থাৎ, পত্রের মাধ্যমে যখন লেখকের সাহিত্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্য থাকে তখন epistle রচিত হয়। অনেক সময় সাধারণ চিঠিপত্রকেও সাহিত্যের অঙ্গীভূত করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে চিঠি ব্যবহার করেছেন। 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসে মহেন্দ্রের বিবাহের পর মাতা রাজলক্ষ্মীকে একটি পত্র লিখেছিল। পত্রটিতে তার এবং আশার দাম্পত্য জীবনের মধুর ভালোবাসার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এই পত্রের আর একজন পাঠক বিনোদিনী। বিনোদিনী মহেন্দ্রের পত্র পাঠকালে তার নিশ্বাসের উষ্ণতা এবং হৃদস্পন্দনের তীব্রতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। একটি পত্র শুধু পত্রলেখক আর পত্র প্রাপকেরই পরিচয় দেয় না তা পত্র পাঠকেরও পরিচয়বাহী হতে পারে। শেষের কবিতা (১৯২৯) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলি ছাড়া চিঠিপত্র মোট ১৭টি খণ্ডে বিভক্ত। ১ নম্বর খণ্ডটি পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লেখা পত্রগুচ্ছ। উৎসর্গপত্রের পেছনের পাতায় 'স্মরণ' বলে একটি কবিতা আছে।

'দেখিলাম খান-কয় পুরাতন চিঠি–
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দু-চারিটি
স্মৃতির খেলনা কটি বহুযত্ন ভরে
গোপন সঞ্চয় করি রেখেছিল ঘরে।'

মৃণালিনী দেবীকে লিখিত মোট ৩৬টি চিঠি মুদ্রিত পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর প্রতি জীবনভাবনার একটি উদাহরণ রাখি–

'ভাই ছুটি,

...তোমাতে আমাতে সকল কাজ ও সকল ভাবেই যদি যোগ থাকত খুব ভালো হত–কিন্তু সে কারো ইচ্ছায়ত্ত নয়, যদি তুমি আমার সঙ্গে সকল বিষয় সকল রকম শিক্ষায় যোগ দিতে পার ত খুসি হই–আমি যা কিছু জানতে চাই তোমাকেও তা জানাতে পারি–আমি যা শিখতে চাই তুমিও আমার সঙ্গে শিক্ষা কর তাহলে খুব সুখের হয়, জীবনে দুজন মিলে সকল বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়–তোমাকে কোন বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করিনে–আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ মেলাবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতে নেই–সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র খুঁৎ খুঁৎ না করে ভালবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর–আমাকে অনাবশ্যক দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহুমূল্য হবে।.... রবি (পত্র ২৪ )।

আরেকটি চিঠি থেকে জীবনবোধ ও ভাবনার খানিকটা নির্যাস দেওয়া যাক–'কোনরকম করে জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সরল করে আনতে না পারলে জীবনে যথার্থ সুখের স্থান পাওয়া যায় না–জিনিসপত্রে গোলেমালে হাঙ্গামহুজ্জুতে হিসেবপত্রই সুখ-সন্তোষের সমস্ত জায়গা নিঃশেষে অধিকার করে বসে–আরামের চেষ্টাতেই আরাম নষ্ট করে দেয়। বহির্ব্যাপারে চেষ্টাকে লঘু করে দিয়ে মানসিক ব্যাপারের চেষ্টাকে কঠিন করে তোলাই মনুষ্যত্বের সাধনা। ছোটখাট ব্যাপারেই জীবনকে ভারগ্রস্ত করে ফেললে বড় বড় ব্যাপারে চেষ্টাকে কঠিন করে তোলাই মনুষ্যত্বের সাধনা। ছোটখাট ব্যাপারে জীবনকে ভারগ্রস্ত করে ফেললে বড় বড় ব্যাপারকে ছেঁটে ফেলতে হয়, সামান্য জিনিসেই সংসারের পথ জটিল হয়ে ওঠে এবং সকলের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। আমার প্রাণের ভিতরটা কেবলই অহর্নিশি ফাঁকার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে–সে ফাঁকা কেবল আকাশ বাতাস এবং আলোকের নয়–সংসারের ফাঁকা, আয়োজন আসবাবের ফাঁকা, চেষ্টা চিন্তা Listening ফাঁকা–খাওয়া পরা আচার ব্যবহার সমস্ত সরল সংযত পরিমিত পরিচ্ছন্ন–চারিদিকে বেশ শান্ত স্বল্পতা–ড্রইংরুম না, ডাইনিংরুম না, নবাবীও না–তক্তপোষ এবং ঢালা বিছানা–শান্তি এবং সন্তোষ–কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা না, বিরোধ বা স্পর্ধা না–এই হলেই জীবন নিজেকে সফল করবার অবকাশ পায়। (পত্র ২৯ )।'

রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে বহির্জগতের সঙ্গে আছে অন্তর্লীন এক ভিতর জগতের অন্তহীন আকুতি।

আছে বিস্ময় কৌতূহল বিরামহীন রূপতাপসের একান্ত সাধনা। যেখানে দ্বন্দ্ব নেই, বিতর্ক নেই, মতান্তর নেই কেবল আছে সংশয় ও জিজ্ঞাসা। কোনো কোনো চিঠিতে ঘন হয়ে আসে উদাসীন প্রকৃতির রূপ বর্ণনা। মৃণালিনী দেবীকে লিখিত পত্রের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি–'যখন ক্ষীণ জ্যোৎস্না এসে পড়ে তখন মনে হয় যেন কোন্ একটা জনহীন মৃত্যুলোকের মধ্যে আছি। আমি বাতি নিবিয়ে দিয়ে জানলার কাছে কেদারা টেনে নিয়ে জ্যোৎস্নায় চুপচাপ করে থাকি বসে থাকি–এই বিশাল জলরাশির সমস্ত শান্তি আমার হৃদয়ের ওপর আবিষ্ট হয়ে আসে...' (পত্র ৩৫)।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলোর মধ্যে আছে জীবনদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে খরস্রোত নব আনন্দের প্রয়াস, মনীষাদীপ্ত রচনা এক নিবিড় উপলব্ধি। যার খণ্ড উপস্থিতিতে ভাস্বর সময় কাল ইতিহাস চেতনা ধর্মদর্শন। জীবনের প্রাত্যহিকতা বা কেজো কথার বিন্যাসকেও তিনি নিয়ে গেছেন এক অনির্বচনীয় উপলব্ধিতে। তিনি সব সময় বলতে চাইছেন–'যিনি ভারতবর্ষকে মূর্তিমান করিয়া তুলবে, অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই ঐতিহাসিককে আহ্বান করিতেছি

রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলোর মধ্যে আছে জীবনদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে খরস্রোত নব আনন্দের প্রয়াস, মনীষাদীপ্ত রচনা এক নিবিড় উপলব্ধি। যার খণ্ড উপস্থিতিতে ভাস্বর সময় কাল ইতিহাস চেতনা ধর্মদর্শন। জীবনের প্রাত্যহিকতা বা কেজো কথার বিন্যাসকেও তিনি নিয়ে গেছেন এক অনির্বচনীয় উপলব্ধিতে। তিনি সব সময় বলতে চাইছেন–'যিনি ভারতবর্ষকে মূর্তিমান করিয়া তুলবে, অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই ঐতিহাসিককে আহ্বান করিতেছি।'

তাঁর চিঠিগুলো চিন্তামাত্রই নয়, শুধু সাধারণ কথার আদানপ্রদান। বরঞ্চ তিনি নিজেই যেন এক পথের পথিক। দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন উক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায়–'a genuine manifestation of Indian spirit।'

তাঁর চিঠিপত্র পড়ে ইংরেজি গীতাঞ্জলির ভূমিকা পত্র মনে পড়ে–'A tradition where poetry and religion are one, has passed through centuries, gathering from learned and unlearned metaphor and emotion are carried back again to the multitude the thought of the scholar and the noble.'

বেশিরভাগ চিঠিই এনে দিয়েছে অন্তর্জগতের দ্বার খোলা বহির্মুখের সন্ধান। দার্শনিক W. S. Urquhart উক্তি অনুযায়ী মনে হয়–'Opend

his soul to the ideas of the West... especially ideas the influence of which upon his whole trend of thought has now always been acknowledged।'

ইন্দিরা দেবীকে লিখিত একটি পত্র উল্লেখ করি–

'....গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমার কথা লিখেছিস্, ওটা কেমন করে লিখলুম এবং কেমন করে লোকের এত ভালো লেগে গেল, সে কথা আমি আজ পর্য্যন্ত ভেবেই পেলুম না।'....

রোদেনস্টাইন আমার কবি যশের আভাস পূর্বেই আর একজন ভারতবর্ষীয়ের কাছে পেয়েছিলেন। তিনি যখন কথাপ্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিত মনে তাঁর হাতে আমার খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি য়েটসের কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন–তারপরে কি হল সে ইতিহাস তোদের জানা আছে। .... তারপরে Irish Theatre-এ আমার ডাকঘরের ইংরেজি তর্জ্জমাটা অভিনয় হবার আয়োজন চলচে–ওটা য়েটস ও তার দলের বিশেষ ভালো লেগেছে।'

প্রমথ চৌধুরীরকে লেখা চিঠি প্রসঙ্গে আসি... কবি লিখছেন,.... 'তোমার এবারকার চিঠিতে 'ছবি ও গান'-এর কথা আছে–বিষয়টা আমার পক্ষে খুব মনোরম সন্দেহ নেই। আজকাল যে সকল কবিতা লিখচি তা ছবি গান থেকে এত তফাৎ যে, আমি ভাবি আমার লেখার আর কোথাও পরিণতি হচ্ছে না, ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন চলছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারচি আমি যেন আর একটা পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি।' (পত্র ৪)

রবি ঠাকুরের নিজস্ব মত অনুযায়ী 'ছবি' মানুষের কাছে চিরকালীন, কিন্তু গান বা কবিতা সতত পরিবর্তনশীল, কারণ শব্দ চিরস্থায়ী নয়। আসলে চিঠির মধ্যে লেখা হয় হৃদয়ের অব্যক্ত অনুভূতিমালা। শেষের কবিতা (১৯২৯) উপন্যাসে দেখি সমাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ স্থান দিচ্ছেন হৃদয়ের অনুভূতি বাহক পত্রকে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে একদিকে আত্মকথন রীতি বা বহু ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ (multiple person view) খুঁজে পাওয়া যায়। ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন–'যদি কোনো লেখকের সবচেয়ে ভালো লেখা চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে, তারও একটি চিঠি লেখার ক্ষমতা আছে।.... যে শোনে এবং যে বলে এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়–' তিনি আরও এক জায়গায় বলছেন–'আমার বোধহয় ঐ লেফাফার মধ্যে একটা মোহ আছে... ।'

শেষের কবিতা (১৯২৯) উপন্যাসে দেখি সমাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ স্থান দিচ্ছেন হৃদয়ের অনুভূতি বাহক পত্রকে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে একদিকে আত্মকথন রীতি বা বহু ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ (multiple person view) খুঁজে পাওয়া যায়। ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন–'যদি কোনো লেখকের সবচেয়ে ভালো লেখা চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে, তারও একটি চিঠি লেখার ক্ষমতা আছে

ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিপত্রগুলো তাঁর আত্মবীক্ষা ও আত্মোদঘাটনের অন্যতম নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। বেশ কিছু ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর পত্রাকারে লেখা। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১২৮৮ ), জাভাযাত্রীর পত্র (১৩৬৬), রাশিয়ার চিঠি (১৩৮৮), পথে ও পথের প্রান্তে (১৩৪৫), পথের সঞ্চয় (১৩৪৬) প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলোতে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছাড়া আধ্যাত্মিক ভাবনা, ছবি আঁকার বিষয়, জমিদারির কথা, নারী ভাবনা, পল্লী উন্নয়ন, সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ সম্ভারের কথা, সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা, শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ, সমাজ-রাজনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা এইসব বিচিত্র বিষয়ের কথা উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের নাম চিঠিপত্র (১৯২৪)। তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধও পত্রাকারে লিখেছেন, যেমন 'বাতায়নিকের পত্র',

'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধগুলো। সবুজপত্রে প্রকাশিত 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটির আঙ্গিকও চিঠি। 'পোস্টমাস্টার' গল্পটিতেও চিঠির অনুষঙ্গ মিলে আছে। কাব্যগ্রন্থে 'পূরবীর'–'শিলঙের চিঠি' পত্রাকারে রচিত।

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ২৩১ নম্বর চিঠি, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮, '...জীবনসায়াহ্নে স্তিমিত দীপালোকে আপনার সঙ্গ নিয়ে আপনি আছি একা, ভালোই আছি, কোন দায়িত্ব নেই, রসাভিষিক্ত চতুর্দশপদী কবিতা লেখবার দাবীও আসছে না কোনখান থেকে–একেই তো বলে মুক্তি। আজ মাঘের আকাশ শ্রাবণের মুখোস পরে আছে। বৃষ্টি নেই কেবল শ্রাবণের নিবিড় ছায়া, আর ভিজে হাওয়া বইছে চারদিক থেকে। সূর্য্যালোকপিপাসু আমার মন স্বাধিকার প্রমত্ত ঋতুর এই অন্যায় ব্যবহার সইতে পারচিনে। মধ্যাহ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে... ।'

কবি অমিয় চক্রবর্তীকে ১১৩ নম্বর পত্রটির খানিকটা উল্লেখ করা যাক।... 'বর্তমান পলিটিকসের চালচলন দেখে মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিল তাই সেই প্রসঙ্গটার কক্ষপথে পৌঁছবমাত্র আমার চিঠি তার ভরাকর্ষণে চ্যাপটা হয়ে পলিটিকসের শনিগ্রহের মতো চারদিকে ঘুর খেতে লাগল। দৌড় দিয়েছে লম্বা চালে কিন্তু রস পেলুম না। মাথার মধ্যে মেঘ ঘনিয়ে ছিল, ভেবেছিলুম একচোট ধারাবর্ষণ কিন্তু হলো কিনা শিলবৃষ্টি। তার কারণ কড়া হাওয়া দিয়েছিল মনের আবহমণ্ডলে। ইতিহাসের ঝোড়ো মাতুনি চলছে জগৎজুড়ে। লুটোপুটি করচে ওষধি বনস্পতি, দোহাই পাড়চে শাখাপ্রশাখারা বধির আকাশের দিকে। এই ধাক্কাটা তাদের ভাঙবেই যাদের মাজা দুর্বল, কাঁচা ফল অনেক যাবে পড়ে পাক ধরার পূর্বেই। একটা সংকটের পর্ব চুকিয়ে দিয়ে যারা টিঁকে থাকবে তারা নতুন জীবনের পালা আরম্ভ করবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অতীতের মাঝখানে যা অনিবার্য তা সব নিষেধকে ঠেলেঠুলে ঢুঁ মারবে ভিতর থেকে। আমরা সেই অনিবার্যতার সঙ্গে জড়িত তাও জানি, আমাদের জোর লাগাতে হবে তার দক্ষিণে নয় বাঁয়ে দাঁড়িয়ে, তাকে চরমে নিয়ে যাব সবাই মিলে সত্যমিথ্যার ঠেলাঠেলিতে। তবু গীতার শাসন মানতেই হবে–ইতিহাস বিধাতার সৃষ্টিকার্যে খাটুনি খাটতেই হবে কিন্তু মনকে রাখতে হবে নিরাসক্ত।'

সামাজিক প্রেক্ষাপট রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ভাবনা কবির মননে বারবার আঘাত হেনেছে। মূল্যবোধের অন্তঃসারশূন্যতা কবি জীবনকে আহত করেছে বারবার। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ১১০ নম্বর চিঠি উল্লেখ করছি–'ছোটখাটো অনাহূত কাজগুলো আলোতে বাদলারাতের পতঙ্গের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ে। তার কোনোটাই বেশিক্ষণ থাকবার মতো নয়–কিন্তু আলোর যথার্থ উদ্দেশ্যটাকে আচ্ছন্ন করে দেয়, তুচ্ছ যত দাবি আমার অবকাশের উপর চারদিক থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, আমার ভাবনা এলোমেলো হয়ে। নিজের সময়ের প্রয়োজনীয়তার দোহাই দিয়ে কারো সামান্য দরকার ঠেকিয়ে রাখা এদেশে অসাধ্য। কেননা আমাদের সমাজটা অত্যন্ত সস্তাদামী সময়ের বারোয়ারী সমাজ, সব সময় সকলেরই। পরের অবকাশের তহবিল-ভাঙা দাবির জন্যে কোনো বিশেষ যোগ্যতার অধিকারভেদ নেই। –একই জাজিম পাতা, অনিমন্ত্রণে সকলেই যেখানে খুশি বসবার গুমর করে। অনায়াসে বলতে পারে, আমি সামান্য লোক বলেই কি আমাকে উপেক্ষা করতে হবে। ভাবতেই পারে না যে জগতে সামান্য লোকের স্থান যদি সামান্য পরিমাণেই না হয় তাহলে অসামান্যদের দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় সদর দরজায়।'

রবি ঠাকুরের এই চিঠিগুলোয় জীবনের দ্বন্দ্ব, সংশয়, বিতৃষ্ণা, ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্টিফেন স্পেনডার-এর একটি উক্তি আংশিক উঠে আসে–'We are living in a time which above all challenges the concept of the individual.'

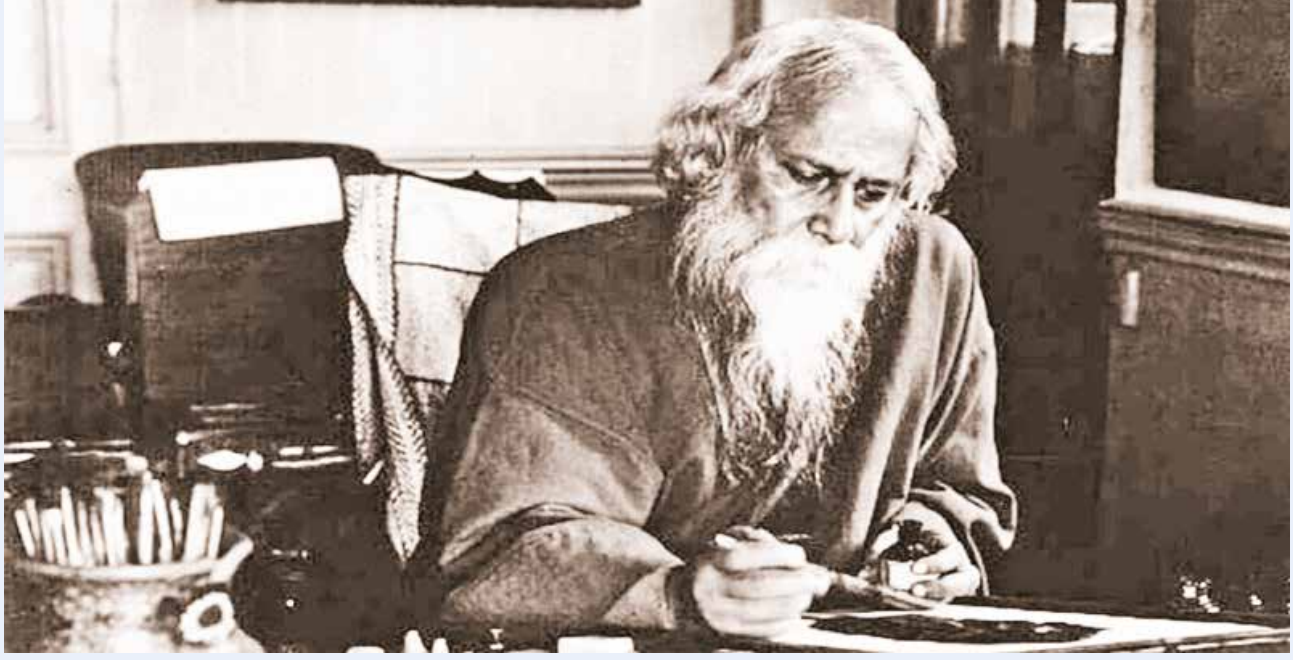

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র পড়তে পড়তে মনে হয় কবি বিষ্ণু দের একটি কবিতার মাধুরী–'পদাবলী ধুয়ে গেছে অনেক শ্রাবণে।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহার্ঘ জীবনেও অনেক বিদ্রুপ, নিন্দা, কুৎসা সহ্য করেছেন কিন্তু চিঠিপত্রে তার বিপ্রতীপ রেখা কখনও চোখে পড়ে না তেমন করে। অসীম কর্মজীবনের পারাবারে সৃষ্টির ক্রমান্বয়তাই কবিকে পর্যাপ্ত সুযোগ জুগিয়েছে।

যেন তিনি ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ পরোক্ষকে এক বৃহৎ তাৎপর্যে মেশাতে চাইলেন। অভিজ্ঞতা, বাস্তবতা, ন্যায়-অন্যায়, সমাজবোধ সমস্তই ভাবনার সূত্রে গাঁথা হয়ে আছে। চিঠিগুলোতে গাছের পাতা যেন বৃষ্টির প্রতীক্ষায়–'waited for rain. ।

রবি ঠাকুরের চিঠিপত্রের মধ্যে কেমন 'আনন্দ ভৈরবী'-র সুর আছে। স্নায়ুতে চৈতন্য মিলে এক নীরাজনে তাঁর অবস্থান। রূপায়নে মুক্তি ঘটেছে চিঠিপত্রে। টি. এস. এলিয়টের The Waste Land- এর কাব্যধ্বনি মনে পড়ে–'Ganga was sunken and the limp leaves waited for rain/ while the black clouds gathered for distant, over Himavant।'

এবার 'ছিন্নপত্রাবলী'তে ফিরে আসি। ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রগুলো।

'কতদিন থেকে কত কত লোক আমার মতো এই রকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করেছে এবং কত কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু হে অনির্বচনীয়, এ কী এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদবেগ, এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কী, অর্থ কী–হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা করে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে।' (চিঠি ৩৫)। আর একটি চিঠি একই ব্যক্তিকে লেখা–'কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিয়োরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখনকার এই গ্রীস্মশীর্ণ ছোট নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসারতা, দুই কূলের অবিরল শান্তি এবং চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুরিয়ে দেবে। এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাইনে। এক বৈষ্ণব কবিদের ছোট ছোট পদ ছাড়া।.... এলিমেন্টস অফ পলিটিক্স জলের উপরে তেলের মতো এখানকার নিস্তব্ধ শান্তির উপর দিয়ে অবাধে ভেসে চলে যায়, এ কে কোনোরকমে নাড়া দিয়ে ভেঙে দেয় না।' (পত্র ৪২)। আর একটি চিঠি–

'প্রেমের যেমন একটা গুণ আছে তার কাছে জগতের মহামহা ঘটনাকেও তুচ্ছ মনে হয়, এখানকার আকাশের মধ্যে তেমনি যে একটি ভাব ব্যক্ত হয়ে আছে তার কাছে কলকাতার দৌড় ঝাঁপ হাঁসফাঁস ধড়ফড়ানি ঘড়-ঘড়ানি ভারী ছোটো এবং অত্যন্ত সুদূর মনে হয়। চারিদিক থেকে আকাশ আলোবাতাস এবং গান একরকম মিলিতভাবে এসে আমাকে অত্যন্ত লঘু করে আপনাদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে–আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎ প্রকৃতির উপর আর এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে, তাতে করে এই সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপরে আর একটা যেন নেশার রঙ লেগেছে।' (পত্র ৬৯)

রবীন্দ্রনাথের অনুভব তাঁর পত্রসাহিত্যে নক্ষত্র আভায় অথবা রজনীর শব্দহীনতায় তাঁর মন নীড়সন্ধানী। পুরাণ, বেদ, উপনিষদে তাঁর আসা যাওয়া। তাই প্রেম ও প্রজ্ঞা, জিজ্ঞাসা বা ছন্দগান সবই সুন্দর রঙিন এবং আর্তিময় তাই তো অধরা মাধুরীকে ছন্দবন্ধনে ধরা তাঁর সম্ভব হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন ঠিক আগন্তুকের পথ ধরে নয় বরঞ্চ সৃজনীর নিভৃত আলাপ একে একে পল্লবিত করে গেছেন তিনি। চিঠির ভাণ্ডার থেকে কয়েকটির ছোঁয়া দেওয়া গেল মাত্র।

আর অধিকাংশই থেকে গেল 'না বলা বাণীর ঘন যামিনীর' মতো। অতিদীর্ঘ পরিসর ছাড়া যা সম্ভব নয়। পরিশেষে এটুকুই বলা যায় কবির বিপুল সৃষ্টির ভাবদর্শনের ছায়া ধরা পড়েছে চিঠিপত্রে যাকে বলা যায় বন্ধ দ্বারে মুক্তির করাঘাতের শব্দ। তাঁর সাহিত্যের মায়াজালের উজ্জ্বল সম্ভারের ইঙ্গিত দেওয়া গেল। কত মুহূর্তই না আমাদের 'ডাকঘর'-এর রাজার চিঠির প্রত্যাশায় রাখে। সুধা আমাদের ভুলতে দেয় না অমলের জন্যে আনা তার ফুলটিকে।

সাহিত্যের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ বহুকালের। চিঠিপত্রকে রবি ঠাকুর ছাড়া তাঁদের প্রকাশের মাধ্যমে বিখ্যাত করেছেন ইংরেজি সাহিত্যে সিডনি স্মিথ, লর্ড চেস্টার ফিল্ড প্রভৃতি। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর চিন্তা ও দর্শনের বৃহত্তর প্রকাশ ঘটিয়েছেন চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' আরেকটি অপূর্ব সংযোজন। অনেক প্রকাশিত ভাবনার মধ্যে যা পাওয়া যায় না চিঠিতে তার প্রাপ্তি ঘটে। আত্ম-উন্মোচনের দিক থেকে কীটস, বায়রন, রিলকে, বোদল্যের–এঁদের চিঠি খুবই উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথের অনুরণন–'এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়/ আপাতত এটা দেরাজে দিলাম রেখে।/ পারো যদি এসে শব্দহীন পায়ে/ চোখ টিপে ধরো হঠাৎ পেছন থেকে।'

আসলে চিঠি এক ধরনের মিশ্রশিল্প বা মিক্সড আর্ট-ফর্ম। জীবনের গভীর চিন্তাভাবনার প্রাবন্ধিক রূপ মিশে আছে চিঠিতে। চিঠি একরকমের শুদ্ধ শিল্প। রবীন্দ্রনাথই বলেছেন–'চিঠি জিনিসটা ছোট্ট মালতীলতার মতোই বড়'। যোগের পূর্ণতা নিয়ে যে সভ্যতা তার বিস্তৃত প্রকাশ থাকে চিঠিতে।

দীপক লাহিড়ী
কবি ও প্রাবন্ধিক

এই সম্পর্কে একটি ইংরেজি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা সমাপ্ত করি।

'They flash upon the inward eye/ which is the bliss of solitude.'

সবশেষে বলি–রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলো এককথায় ইচ্ছে থেকে আলোর পথ চলা।

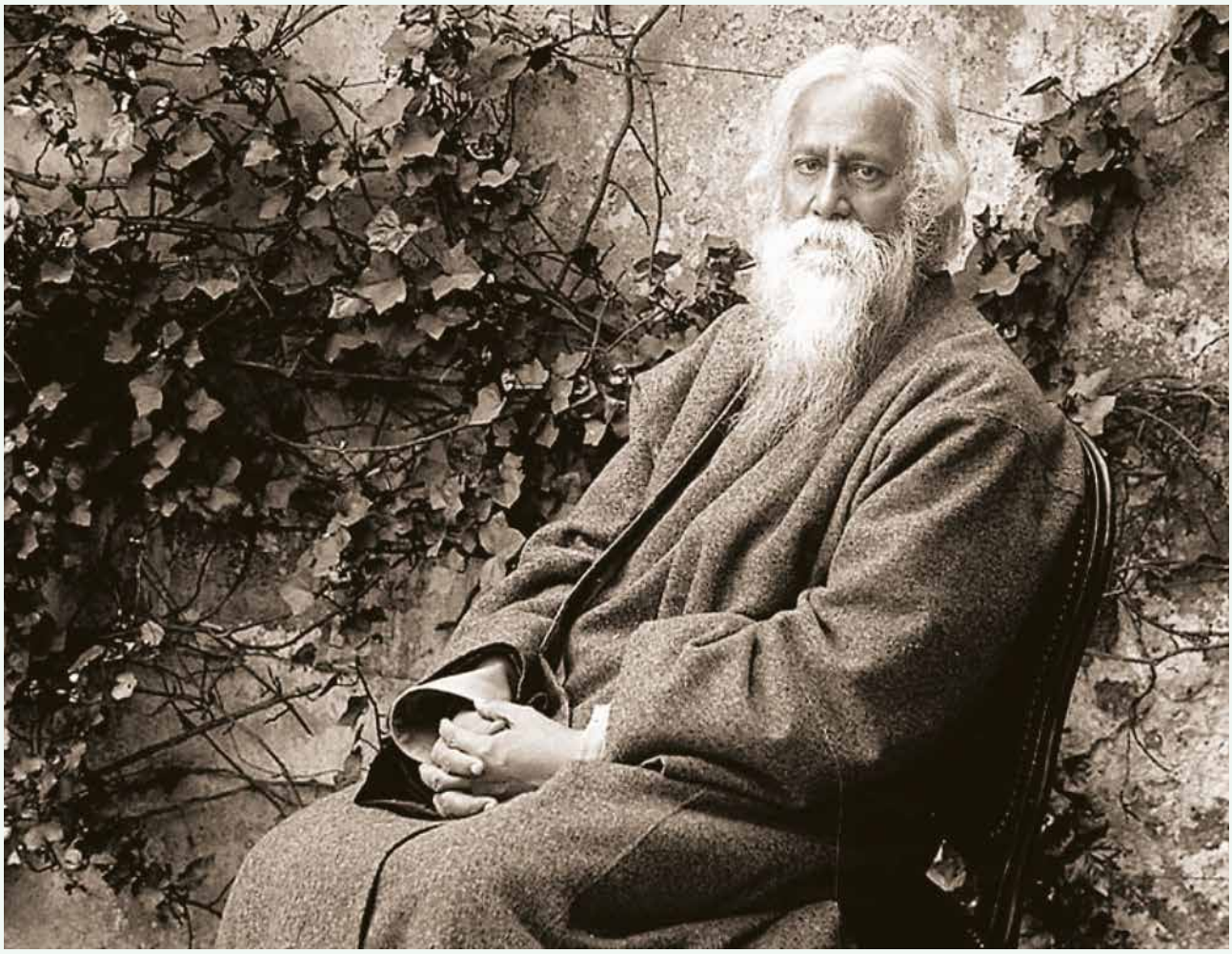

প্রবন্ধ

# রবীন্দ্রসাহিত্যে ক্যামেরা

সুদীপ্ত সালাম

‘...বাড়ির মেয়েরা নিজেরা সাজিতে এবং ছোটদের সাজাইতে ব্যস্ত, রথীন্দ্রনাথ নিজের একটি ক্যামেরা ঠিক করিতেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক ছাত্রকে ‘‘সিটিং’’ দিতেছেন। খানিক পরে তিনি উঠিয়া আসিলেন। একটি ছবিতে তিনি বসিলেন, চারদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল তাঁহার নাতি নাতনী ও নাতবৌয়ের দল। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি শিশুকন্যা কবির কোলে গিয়ে বসিল। আর-একটি ছবিতে তাঁহার পুত্র কন্যা ও পুত্রবধূ যোগ দিলেন।’ ১৯১৬ সনের এপ্রিলে সীতা দেবী জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি গিয়ে এই দৃশ্য দেখতে পান। ঠাকুরবাড়িতে ফটোগ্রাফিচর্চার একটি চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে তার এই বর্ণনায় (পুণ্যস্মৃতি, ১৩৪৯)। অনেকের স্মৃতিচারণা থেকে অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথের আমলে এ বাড়িতে ফটোগ্রাফিচর্চা সহজতর হয়। চিত্রা দেব জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের বৌদি জ্ঞানদানন্দিনী একবার একরকম জোর করে বাড়িতে ফটোগ্রাফার এনে বাড়ির নারীদের ছবি তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন

চিত্রা দেব মন্তব্য করেছেন, 'সেদিন তাঁর আগ্রহ আর উৎসাহ না থাকলে অনেকেই হয়ত ক্ষণকালের আভাস থেকে চিরকালের অন্ধকারে হারিয়ে যেতেন।' বোঝাই যাচ্ছে, সেকালে এ বাড়িতে ছবি তোলাটা সোজা ব্যাপার ছিল না।

ওই যে বললাম, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের পর থেকে ঠাকুর পরিবারে ফটোগ্রাফিচর্চা সহজ হয়, তার প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথের নিজের অজস্র ছবি। সিদ্ধার্থ ঘোষ যথার্থই বলেছেন, '...অনেক বিষয়ের মতো ফোটোগ্রাফারদের আকর্ষণ করার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। চলচ্চিত্র জগতের কথা বাদ দিলে উদয়শঙ্কর ছাড়া আজ অবদি আর কোনো বাঙালির বিভিন্ন বয়সের ও মেজাজের এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ফোটোগ্রাফিক সম্ভার আর রচিত হয়নি।' দেশে-বিদেশে তার অসংখ্য ছবি তোলা হয়েছে। তার ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারেননি ইতালির একনায়ক বেনিতো মুসোলিনিও। ১৯২৫-২৬ সনে দুইবার ইতালি গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সে তাকে ক্যামেরাবন্দি করেন মুসোলিনি। কলকাতার 'বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড' এবং নীলমাধবদের 'দ্য বেঙ্গল ফোটোগ্রাফার্স'-এর মতো সেসময়ের বিখ্যাত স্টুডিওতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ পোরট্রেট করিয়েছেন, এসব তথ্য তার ফটোগ্রাফির প্রতি প্রবল আগ্রহকেই সমর্থন করে। সেসময় রঙিন ছবি ছিল দুর্লভ। রবিবাবু নিজের রঙিন ছবি করিয়েছিলেন বলেও প্রমাণ মেলে। লেখক সীতা দেবী জানিয়েছেন, তিনি নিজে ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রঙিন ছবি দেখেছেন। সে ১৯২১ সনের ২৩ জুলাইয়ের কথা।

এখন প্রশ্ন হলো, রবীন্দ্রনাথ নিজে ফটোগ্রাফিচর্চা করতেন কিনা। রবীন্দ্রনাথ ছবি তুলতেন এমন কোনো প্রমাণ এখনো মেলেনি। তার ব্যবহার্য জিনিসপত্রের তালিকায়ও নেই ক্যামেরা। কিন্তু ক্যামেরার প্রতি ছিল তার ভীষণ আগ্রহ। তাই তো তার সাহিত্যে ঘুরেফিরে ক্যামেরার প্রসঙ্গ এসেছে। সে আলোচনায় যাওয়ার আগে, ক্যামেরার সঙ্গে তার সম্পর্কের একটি চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।

চলচ্চিত্র কবিকে বেশ প্রভাবিত করেছিল। নিজের চলচ্চিত্র ভাবনা সম্পর্কে ১৯২৭ সনে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি বলছেন, 'সিনেমাতে বিশেষ বিশেষ আখ্যানকে নাচের ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করলে কেমন হয়?... সিনেমাতে আছে রূপের সঙ্গে গতি; সেই সুযোগটিকে যথার্থ আর্টে পরিণত করতে গেলে আখ্যানকে নাচে দাঁড় করানো চলে।' ১৯২৯ সনে মুরারি ভাদুড়িকে লেখা চিঠিতে তিনি আরো বলছেন, 'আমার বিশ্বাস ছায়াচিত্রকে অবলম্বন করে যে নতুন কলারূপের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় এখনো তা দেখা যায়নি।... ছায়াচিত্রের প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য বা মহিমা এমন করে পরিস্ফুট করা উচিৎ যা কোনো বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক করতে পারে।' শুধু চলচ্চিত্রচিন্তা ব্যক্তই করেননি, চলচ্চিত্রের কাজে নেমেও পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩২ সনে মুক্তি পায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত প্রথম ও একমাত্র চলচ্চিত্র 'নটীর পূজা'। সে সিনেমায় ক্যামেরার কাজটি করেছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার নীতীন বসু।

স্থিরচিত্রে ফেরা যাক। রবীন্দ্রনাথ নিজে ক্যামেরায় ছবি তুলুন আর না তুলুন, ফটোগ্রাফি যে তার একটি ভালো লাগার জায়গা তাতে সন্দেহ নেই। ঠিক কবে থেকে ক্যামেরার সঙ্গে তাঁর পরিচয় তার দিনক্ষণ বলা মুশকিল হলেও, জানা গেছে তাঁর প্রথম ছবি তোলার ইতিহাস। ১৯৮৬ সনে প্রকাশিত মনোজ দত্তের 'রবীন্দ্র-সকাল' শিরোনামের ছোট্ট বইয়ে সে ঘটনার উল্লেখ আছে। এই বইয়ে বলা হয়েছে, 'একদিন রবিকে নিয়ে শ্রীকণ্ঠবাবু ফটো তুলতে গেলেন একজন ইংরেজ ফটোগ্রাফারের দোকানে। তাঁর সঙ্গে তিনি হিন্দিতে বাংলাতে আলাপ জমিয়ে তুললেন, তারপর অত্যন্ত আত্মীয়ের মতো বললেন, ছবি তোলার জন্য অতো বেশি দাম আমি কিছুতেই দিতে পারবো না সাহেব। আমি গরিব মানুষ...। তাঁর কথাবার্তায় সাহেব কিন্তু খুশিই হলেন আর কম দামে ছবি তুলে দিলেন।' মনোজ দত্ত দাবি করেছেন, এটিই রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম ফটোগ্রাফ। দাবিটি পোক্ত না হলে বইটি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়ে পাঠ্য হতো না। কবি এই শ্রীকণ্ঠ সিংহের স্মৃতিচারণ করেছেন তার 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে। রবীন্দ্র-গবেষক সৈয়দ আকরাম হোসেন বলেছেন, সঙ্গীতচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রীকণ্ঠ বাবুর প্রিয় শিষ্য। যাহোক, তারপর তো ছবির বন্যা বয়ে গেছে।

ফটোগ্রাফির প্রতি কবিগুরুর আগ্রহের আরো বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় 'গুরুদেবের স্মৃতি' শিরোনামের লেখায় জানিয়েছেন, ১৯৩৭ সনে তিনি তার পুত্রকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান। তার হাতে ছিল ক্যামেরা। কবি ক্যামেরা দেখে বললেন, 'কি, ছবি তুলবি বুঝি? ছবি কিন্তু আমাকে দিতে হবে।' শুধুই কি তাই! রবি ঠাকুর ফটোগ্রাফে অটোগ্রাফ দিয়ে প্রিয়জনদের উপহার হিসেবে পাঠাতেন। ১৩৮৭ সনে 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতার বিবাহ প্রসঙ্গ' লেখা থেকে জানা যায়, ১৩০৩ সনে রবীন্দ্রনাথ মহারাজা বীরচন্দ্রের নিমন্ত্রণে কার্শিয়াং যান। সেসময় বীরচন্দ্রের তোলা ছবিগুলোর একটি রবীন্দ্রনাথ তার কন্যা মাধুরীলতাকে তার জন্মদিনে সই করে পাঠিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, 'বেলির জন্মদিনের উপহার। ৯ই কার্তিক। ১৩০৩। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্শিয়াং।'

কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফটোগ্রাফিচর্চা করতেন। পিতা-পুত্রের মধ্যে ফটোগ্রাফি নিয়ে কথাও হতো। রথীন্দ্রনাথ ছবি তুলে বাবাকে দেখাতেন এবং তার মন্তব্য জানতে চাইতেন। ১৯০৭ সন, রথীন্দ্রনাথ তখন যুক্তরাষ্ট্রে। বাবাকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা এক পত্রে তিনি জানাচ্ছেন, 'নাচতে এ দেশের লোক পরিশ্রান্ত হয় না। আমার সামনেই দু'এক জন মেয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা নাচ চালালেন। আমাদের দু'জনের কাছে ছবি তোলবার ক্যামেরা ছিল। মেয়েরা ছবি তোলাবার জন্যে পিড়াপিড়ি আরম্ভ করলেন। তাঁদের একটা group তুললুম। আরো ক'টা ছবি তুলেছি, কি রকম হয়েছে দেখো।' আরেকটি চিঠিতে (১৯১৬) দেখা যায়, পাসপোর্টের জন্য রবীন্দ্রনাথ ছেলের কাছ থেকে নিজের ফটোগ্রাফ চাইছেন, 'শুরলের কাছে শীঘ্র আমার দুটো ছোটো ফোটোগ্রাফ পাসপোর্টের জন্যে পাঠাতে ভুলিস নে। যাতে আমার সামনের মুখ আছে এমন একটা দিস।' ছেলে রথীন্দ্রনাথকে যে তিনি ফটোগ্রাফিতে উৎসাহিত করতেন তা অনুমান করা ভুল হবে না।

আরো বেশ কয়েকজনকে তিনি ফটোগ্রাফিচর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন বলে প্রমাণ মেলে। যেমন উৎসাহ যুগিয়েছেন ভাইপো গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ১৮৯৪ অথবা ১৮৯৫ সনে শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখছেন, 'একবার এখানে আসতে পারতে যদি ছবি নেবার ঢের জিনিষ পেতে। শীতের সময় যদি একবার আসতে পার–তাহলে আমাদের জমিদারী illustrated হয়ে যায়।' ১৯০০ সনে লেখা আরো একটি চিঠিতে তিনি গগনেন্দ্রনাথকে বলছেন, '...নিশ্চয়ই আসবার চেষ্টা কোরো। ফোটোগ্রাফের সরঞ্জাম এনো। আজকাল শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় পদ্মার চর যে কি চমৎকার দেখতে হয় চক্ষে না দেখলে বুঝতে পারবে না।'

ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোরের বৈমাত্রেয় ভাই সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন। তিনি ভারতের বিভিন্ন পুরাকীর্তির ছবি তুলেছিলেন। ১৩৩৩ সনে তিনি সেসব ছবি সংবলিত 'স্মৃতি : কথা ও চিত্র' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। বইয়ের ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেছেন এই বই করতে তাকে অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। করারই কথা, কেননা কবি মনে করতেন, '...প্রাচীন দেবালয় দিঘি ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের ফোটোগ্রাফ এবং প্রাচীন-পুঁথি পুরালিপি প্রাচীন-মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে তাহা বলা বাহুল্য।' (সাহিত্য, ১৯০৭)।

এবার আসা যাক, রবীন্দ্রসাহিত্যে ফটোগ্রাফি কতটা জায়গা পেয়েছিল সেই আলোচনায়। ফটোগ্রাফিও রবীন্দ্রসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্গদেশে ক্যামেরা আসে কমপক্ষে ১৮৪০ সনে। তার প্রায় কুড়ি বছর পর রবীন্দ্রনাথের জন্ম। ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণটি বাংলায় ফটোগ্রাফি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টায় ফটোগ্রাফি বেশ ঋদ্ধ, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখে গেছে। এসময় বেরিয়ে গেছে বেশ কয়েকটি বাংলা ফটোগ্রাফি বই! অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্যে তৈরি করে ফেলেছেন শক্ত অবস্থান। ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ও 'চৈতালি'র মতো বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ তার সময়ে ফটোগ্রাফির উত্থানকে এড়িয়ে যাননি। যদিও তিনি আলাদা করে ফটোগ্রাফি নিয়ে লেখেননি, কিন্তু তার লেখালেখিতে ঘুরেফিরে এসেছে ফটোগ্রাফির প্রসঙ্গ।

তবে ফটোগ্রাফিকে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন। তিনি ফটোগ্রাফিকে 'আর্ট' বা 'আর্ট' সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে দেখেননি। সেসময় হয়তো সেভাবে দেখার সুযোগও ছিল না। রবীন্দ্র-পরবর্তী ফটোগ্রাফি

মহীরুহ হয়ে উঠেছে। এমনটি যে হবে তা তিনি হয়তো অনুমান করতে পারেননি। কবি অনেকের মতো ক্যামেরাকে একটি অনন্য প্রাযুক্তিক উদ্ভাবন হিসেবে দেখেছিলেন। তবে কবি যদি আরো কিছু বছর বেঁচে থাকতেন তাহলে ফটোগ্রাফি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হতো এটি একটি প্রশ্ন।

মৃত্যুর কয়েক বছর আগেও কবি ক্যামেরা সম্পর্কে বলছেন, 'ফোটোগ্রাফের ক্যামেরাকে কৃত্রিম চোখ বলিতে পারি। এই ক্যামেরা খুব স্পষ্ট করিয়া দেখে কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া দেখে না, তাহা চলতিকে দেখে না, যাহাকে দেখা যায় না তাহাকে দেখে না। এইজন্য বলা যায় যে, ক্যামেরা অন্ধ হইয়া দেখে। সজীব চোখের পিছনে সমগ্র মানুষ আছে বলিয়া তাহার দেখা কোনো আংশিক প্রয়োজনের পক্ষে যত অসম্পূর্ণ হোক মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ব্যবহারক্ষেত্রে তাহাই সম্পূর্ণতর। বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে তিনি চোখের বদলে আমাদিগকে ক্যামেরা দেন নাই।' (ছোটো ও বড়ো, কালান্তর, ১৩৪৪)। ফটোগ্রাফি সম্পর্কে এর চেয়ে বিস্তারিতভাবে ও স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ আর কোথাও বলেননি। এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, শুধু ক্যামেরার ওপর তার ভরসা ছিল কম। তিনি চোখের ওপরই ভরসা করতেন কেননা, 'সজীব চোখের পিছনে সমগ্র মানুষ আছে।' ক্যামেরার পেছনে যদি ওই সমগ্র মানুষ দাঁড়ায় তখন? কিন্তু সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট করেননি। এমনও তো হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ক্যামেরায় শিল্পী মানুষের 'ভ্যালু' যোগ করার প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে চেয়েছেন? 'আত্মপরিচয়' (১৩৫০)-এ বলছেন, 'সজীব চোখ তো ক্যামেরা নয়, ভালো করে দেখে নিতে সে সময় নেয়। ঘন্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল দৌড়ের দেখা তার পক্ষে কুয়াশা দেখা।'

রবীন্দ্রনাথ ক্যামেরাকে বাস্তবের প্রতিলিপিকার হিসেবে দেখতেন। তথ্য ও যুক্তি যার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, শিল্পীর মতো কল্পনাপ্রবণ নয় একজন 'ক্যামেরাওয়ালা'। তিনি বলছেন, 'ছেলেবেলায় আমাদের অন্তঃপুরের যে-বাগানে বিশ্বপ্রকৃতি প্রত্যহই এক-একটি সূর্যোদয়কে তার নীল থালায় সাজিয়ে এক-একটি বিশেষ উপহারের মতো আমার পুলকিত হৃদয়ের মাঝখানে রেখে দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসত, ভয় আছে, একদিন আমার কোনো ভাবী চরিতকার ক্যামেরা হাতে সেই বাগানের ফোটোগ্রাফ নিতে আসবে। সে অরসিক জানবেই না, সে-বাগান সেইখানেই যেখানে আছে ইদেনের আদিম স্বর্গোদ্যান। বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের প্রতি উদাসীন আর্টিস্ট সেই স্বর্গে যেতেও পারে, কিন্তু কোনো ক্যামেরাওয়ালার সাধ্য নেই সেখানে প্রবেশ করে–দ্বারে দেবদূত দাঁড়িয়ে আছে জ্যোর্তিময় খড়্গ হাতে।' (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি, ১৩৩৬)। 'আত্মপরিচয়'-এ আরো বলেছেন, 'চলার ছবি ফোটোগ্রাফে হাস্যকর হয়, কেবলমাত্র আর্টিস্টের তুলিতেই তার রূপ ধরা পড়ে।' দেখা যায় 'শেষের কবিতা'র অমিত চরিত্রও তার স্রষ্টা রবিবাবুর ভাবনাকে বহন করে, 'ক্যামেরা হাতে দৃশ্য দেখে বেড়াবার শখ অমিতের নেই। সে বলে, আমি টুরিস্ট না, মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।'

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ফটোগ্রাফিকে একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসেবে দেখেছিলেন। তার আভাস পাওয়া যায় 'সাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' থেকে। তিনি লিখেছেন, 'বিজ্ঞানের সূর্যাস্ত হচ্ছে নিছক সূর্যাস্ত ঘটনাটি; চিত্রের সূর্যাস্ত হচ্ছে কেবল সূর্যের অন্তর্ধানমাত্র নয়, জল স্থল আকাশ মেঘের সঙ্গে মিশ্রিত করে সূর্যাস্ত দেখা; সাহিত্যের সূর্যাস্ত হচ্ছে সেই জল স্থল আকাশ মেঘের মধ্যবর্তী সূর্যাস্তকে মানুষের জীবনের উপর প্রতিফলিত করে দেখা–কেবলমাত্র সূর্যাস্তের ফোটোগ্রাফ তোলা নয়, আমাদের মর্মের সঙ্গে তাকে মিশ্রিত করে প্রকাশ।' তিনি ক্যামেরাকে শিল্পমাধ্যম হিসেবে দেখেননি ঠিকই–তাই বলে ক্যামেরার শক্তিকে খাটো করেও দেখেননি। 'নক্ষত্রলোক' প্রবন্ধে বলছেন, 'নক্ষত্রলোকের বাহিরের নিবিড় কালো আকাশেও অনবরত নানাবিধ কিরণ বিকীর্ণ হচ্ছে। এই-সকল অদৃশ্য দূতকেও দৃশ্যপটে তুলে তাদের কাছ থেকে গোপন অস্তিত্বের খবর আদায় করতে পারছি এই বর্ণলিপিযুক্ত দুরবীন–ফোটোগ্রাফের সাহায্যে।...সেই শক্তির উদ্বোধন করলে বিজ্ঞান, দূরতম আকাশে জাল ফেলবার কাজে লাগিয়ে দিলে ফোটোগ্রাফ। এমন ফোটোগ্রাফি বানালে যা অন্ধকারে-মুখঢাকা আলোর উপর সমন জারি করতে পারে। দুরবীনের সঙ্গে ফোটাগ্রাফি, ফোটোগ্রাফির সঙ্গে বর্ণলিপিযন্ত্র জুড়ে দিলে। সম্প্রতি এর শক্তি আরো বিচিত্র করে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথ ক্যামেরাকে শিল্প মাধ্যম হিসেবে দেখেননি–এই ভাবনার পক্ষে বিপক্ষে বিস্তর আলোচনা করা সম্ভব। মানতেই হবে, অন্তত সেসময় 'ফটোগ্রাফি শিল্প নয়' বলার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। এই আলোচনাকে পাশে রেখে আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যকর্মের দিকে তাকাই তাহলে দেখব, ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফি সেখানে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে জায়গা পেয়েছে। তার প্রবন্ধ-সাহিত্যে যে ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফি প্রসঙ্গ এসেছে তা আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। এবার কবিতায় মুখ ফেরানো যাক।

কবিগুরুর বিভিন্ন কবিতায় ফটোগ্রাফি অনুষঙ্গ হিসেবে উঠে এসেছে। কবি ফটোগ্রাফকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ভীষণ গুরুত্ব দিতেন। গল্প-উপন্যাসেও আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথসৃষ্ট চরিত্রগুলো কি আকুল হয়ে প্রিয়জনের ফটোগ্রাফ বুকে আগলে রাখছে। তার কবিতায়ও ফটোগ্রাফ বারবার এসেছে স্মৃতিকে উস্কে দেয়ার অনুষঙ্গ হিসেবে। যেমন–

অনিলেরই হাতে লেখা।
তার সঙ্গে টুকরো টুকরো ছেঁড়া একটা ফোটোগ্রাফ।
আর ছিল বছর চার আগেকার
দুটি ফুল, লাল ফিতেয় বাঁধা
মেডেন-হেয়ার পাতার সঙ্গে
শুকনো প্যান্‌সি আর ভায়োলেট।
.....

সুনৃতার ঘর তিনতলায়।
দক্ষিণ দিকে দুই জানলা,
সামনে পালঙ্ক,
বিছানা লক্ষ্মৌ-ছিটে ঢাকা।
অন্য দেয়ালে লেখবার টেবিল,
তার কোণে মায়ের ফোটোগ্রাফ–
তিনি গেছেন মারা।
বাবার ছবি দেয়ালে,
ফ্রেমে জড়ানো ফুলের মালা। (ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, পুনশ্চ)

আয়না-ফ্রেমের তলে ছেলেবেলাকার ফোটোগ্রাফ
কে রেখেছে, ফিকে হয়ে গেছে তার ছাপ।
পাশাপাশি ছায়া আর ছবি। (জানা-অজানা, আকাশপ্রদীপ)

দেয়াল থেকে খসিয়ে নিল ছবিগুলো,
একটা বিশেষ ফোটো
মুছল আপন আস্তিনেতে অকারণে। (বাসাবদল, সানাই)

রবীন্দ্রনাথ আলোকচিত্রচর্চা করে থাকুন আর না থাকুন, তার গল্প-উপন্যাসের অনেক চরিত্রকে ঠিকই ফটোগ্রাফি করতে দেখা যায়। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে দেখি,

'বিপ্রদাসের ফোটোগ্রাফ তোলার শখ, কুমুও তাই শিখে নিলে। ওরা কেউ-বা নেয় ছবি, কেউ-বা সেটাকে ফুটিয়ে তোলে।' 'অপরিচিতা' গল্পে দেখি গল্পের কথক ফটোগ্রাফিচর্চা করেন–যিনি তার ক্যামেরাটি ভুলে রেলস্টেশনে ফেলে ফেলে রেখে যান, 'আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল–গ্রাহ্যই করিলাম না।' একই গল্পে দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ একটি ফটোগ্রাফকে কেন্দ্র করে কি অপূর্ব দৃশ্যকল্প তৈরি করেছেন! 'হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বৈকি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো-একটি বাক্সে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না। যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারো পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না।'

'বালাই' গল্পেও ফটোগ্রাফের প্রসঙ্গ এসেছে। 'এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, ''কাকি, আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।'' বিলেত যাবার পূর্বে

একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।'

'চোখের বালি' উপন্যাসের মহেন্দ্রও তো ফটোগ্রাফিচর্চা করত। ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন, 'হঠাৎ মহেন্দ্রের ফোটোগ্রাফ-অভ্যাসের শখ চাপিল। পূর্বে সে একবার ফোটোগ্রাফি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন আবার ক্যামেরা মেরামত করিয়া আরক কিনিয়া ছবি তুলিতে শুরু করিল।'

মহেন্দ্র একবার ঠিক করল বিনোদিনীর ছবি তুলবে, কিন্তু বিনোদিনী তো রাজি হয় না। মহেন্দ্র অনুমতি ছাড়াই তার ছবি তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। মহেন্দ্রর বিনোদিনীর ছবি তোলার উদ্যোগকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া ক্যামেরা আনিল। কোন্ দিক হইতে ছবি লইলে ভালো হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য বিনোদিনীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাদিক হইতে বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে হইল। এমন-কি, আর্টের খাতিরে অতি সন্তর্পণে শিয়রের কাছে তাহার খোলা চুল এক জায়গায় একটু সরাইয়া দিতে হইল-পছন্দ না হওয়ায় পুনরায় তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইল। আশাকে কানে কানে কহিল, 'পায়ের কাছে শালটা একটুখানি বাঁ দিকে সরাইয়া দাও।'

অপটু আশা কানে কানে কহিল, 'আমি ঠিক পারিব না, ঘুম ভাঙাইয়া দিব–তুমি সরাইয়া দাও।'

মহেন্দ্র সরাইয়া দিল।

অবশেষে যেই ছবি লইবার জন্য ক্যামেরার মধ্যে কাচ পুরিয়া দিল, অমনি যেন কিসের শব্দে বিনোদিনী নড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল।'

এই উপন্যাসেও দেখা যায়, ফটোগ্রাফ স্মৃতিকে উৎস দিচ্ছে কিন্তু সে স্মৃতি ভালোবাসাকে জাগায় না, ঘৃণার আগুনে ঘি ঢেলে দেয়, '... আশা দেখিল সম্মুখের দেয়ালে মহেন্দ্রের ছবির পার্শ্বেই আশার একখানি ফোটোগ্রাফ ঝুলানো রহিয়াছে। ইচ্ছা হইল, সেখানা আঁচল দিয়া ঝাঁপিয়া ফেলে, টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া আসে। অভ্যাসবশত কেন যে সেটা চোখে পড়ে নাই, কেন সে যে এতদিন সেটা নামাইয়া ফেলিয়া দেয় নাই, তাহাই মনে করিয়া সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন মহেন্দ্র মনে মনে হাসিতেছে এবং তাহার হৃদয়ের আসনে যে বিনোদিনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, সে-ও যেন তাহার জোড়া-ভুরুর ভিতর হইতে ঐ ফোটোগ্রাফটার প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিতেছে।'

আলো-ছায়ায় আঁকা আলোকচিত্রে প্রেয়সীকে ধরার তীব্র অভিলাষ রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়। 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপকে বলতে শুনি, 'এই টেবিলের উপরকার ফোটো-স্ট্যাণ্ডে নিখিলের ছবির পাশে মক্ষীর ছবি ছিল। আমি সে ছবিটি খুলে নিয়েছিলুম। কাল মক্ষীকে সেই ফাঁকটা দেখিয়ে বললুম, কৃপণের কৃপণতার দোষেই চুরি হয়, অতএব এই চুরির পাপটা কৃপণে চোরে ভাগাভাগি করে নেওয়াই উচিত। কী বলেন?

মক্ষী একটু হাসলে; বললে, ও ছবিটা তো তেমন ভালো ছিল না।

আমি বললুম, কী করা যাবে? ছবি তো কোনোমতেই ছবির চেয়ে ভালো হয় না। ও যা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব।' ওদিকে 'শেষের কবিতা'র শোভন আবর্জনা থেকে তুলে নিচ্ছে 'লাবণ্যর একটি অযত্নম্লান ফোটোগ্রাফ।' 'দুই বোন' উপন্যাসেও ঊর্মি চরিত্রের একই রকম আকুলতা ধরা পড়েছে, 'নীরদের একখানা ফোটোগ্রাফ রেখেছে ডেস্কের উপর। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, আগ্রহের চিহ্ন নেই। সে ওকে ডাকে না, তবে ওর প্রাণ সাড়া দেবে কাকে।'

'যোগাযোগ' উপন্যাসে দেখা যায় মধুসূদন শ্যামাকে ছবির ফ্রেম উপহার দিচ্ছে। কিন্তু শ্যামা যেন বুঝতে পারে না-কী হবে এই ফ্রেম দিয়ে, 'মধুসূদন বললে, 'জান না, এতে ফোটোগ্রাফ রাখতে হয়।'

শ্যামার বুকের ভিতরটাতে কে যেন চাবুক চালিয়ে দিলে, বললে, 'কার ফোটোগ্রাফ রাখবে?'

'তোমার নিজের। সেদিন সেই যে ছবিটা তোলানো হয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথ নাটকেও ফটোগ্রাফকে উপলক্ষ করে অসামান্য চিত্রকল্প রচনা করেছেন। 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে যতীন ও হিমির মধ্যকার সংলাপের একাংশ তুলে ধরা হলো–

যতীন। এই যে, হিমি এসেছিস। আঃ বাঁচলুম। সেই ফোটোটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি নে, তুই একবার দেখ-না, বোন।

হিমি। কোন্ ফোটো, দাদা।

যতীন। সেই-যে বোটানিকেল গার্ডনে মণির সঙ্গে গাছতলায় আমার যে-ছবি তোলা হয়েছিল।

হিমি। সেটা তো তোমার আলবামে ছিল।

যতীন। এই-যে খানিক আগে আলবাম থেকে খুলে নিয়েছি। বিছানার মধ্যেই কোথাও আছে–কিংবা নীচে পড়ে গেছে।

হিমি। এই-যে দাদা, বালিশের নীচে।

শুরু হয় যতীনের স্মৃতি রোমন্থন, 'মনে হয় যেন আর-জন্মের কথা। সেই নিমগাছের তলা। মণি পরেছিল কুসমি রঙের শাড়ি। খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে নিচু করে বাঁধা। মনে আছে হিমি, কোথা থেকে একটা বউ-কথা-কও ডেকে ডেকে অস্থির হচ্ছিল। নদীতে জোয়ার এসেছে–সে কী হাওয়া, আর ঝাউগাছের ডালে ডালে কী ঝর্‌ঝরানি শব্দ। মণি ঝাউয়ের ফলগুলো কুড়িয়ে তার ছাল ছাড়িয়ে শুঁকছিল– বলে, আমার এই গন্ধ খুব ভালো লাগে। তার যে কী ভালো লাগে না, তা জানি নে। তারই ভালো লাগার ভিতর দিয়ে এই পৃথিবীটা আমি অনেক ভোগ করেছি।'

এই চিত্রকল্পের শেষটা করুণ রসে সেঁতসেঁতে, যতীন ছবিটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'সেদিন গাছের তলা কথা কয়ে উঠেছিল। আজ এই দেয়ালের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী একেবারে চুপ।'

ফটোগ্রাফি রবীন্দ্রনাথকে এতোটাই প্রভাবিত করেছিল যে, বিভিন্ন সময় তিনি ফটোগ্রাফিকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন, বর্তমান সময়েও যা বিরল। 'আত্মপরিচয়'-এ তিনি বলছেন, 'যতখানি দূরে এলে কল্পনার ক্যামেরায় মানুষের জীবনটাকে সমগ্রলক্ষ্যবদ্ধ করা যায় আধুনিকের পুরোভাগ থেকে আমি ততটা দূরেই এসেছি।' 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের সূচনাপত্র বলেছেন, 'মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ দিচ্ছে অন্তরে।' 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'তে বলেছেন, 'মানুষের স্মরণশক্তি যদি ফোটোগ্রাফের প্লেটের মতো সম্পূর্ণ নির্বিকার হত তা হলে সে আপন ইতিহাস থেকে উঞ্ছবৃত্তি করে মরত, বড়ো জিনিস থেকে বঞ্চিত হত।' ফটোগ্রাফের প্লেট তিনি আরো একবার উপমা হিসেবে করেছেন অন্য প্রসঙ্গে। ১৮৯৩ সনে এক চিঠিতে বলছেন, 'কারও কারও মন ফোটোগ্রাফের wet plate-এর মতো; যে ছবিটা ওঠে সেটাকে তখনি ফুটিয়ে কাগজে না ছাপিয়ে নিলে নষ্ট হয়ে যায়। আমার মন সেই জাতের।'

এছাড়া শিল্পকলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে দর্শন তা ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি যখন বলেন, 'মানুষ তো শুধু চোখ দিয়া দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে। চোখ ঠিক যেটি দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ এ কথা মানা চলিবে না–চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয় তবেই সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।' (ছবির অঙ্গ) তখন মনে হয় তিনি তো ফটোগ্রাফি নিয়েই বলেছেন! ফটোগ্রাফি প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে, তারপরও ফটোগ্রাফিচর্চার প্রধান সমস্যা, সবসময় চোখের ছবিতে মনের ছবিটা জুড়ে দেয়া হচ্ছে না। •


অন্যান্য তথ্যসূত্র :

১. পুণ্যস্মৃতি–সীতা দেবী
২. ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল–চিত্রা দেব
৩. ছবি তোলা : বাঙালির ফোটোগ্রাফি-চর্চা–সিদ্ধার্থ ঘোষ
৪. রবীন্দ্রনাথের ছবি তুলেছিলেন মুসোলিনি–দিলীপ মজুমদার, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ ডিসেম্বর, ২০১৯
৫. কলকাতার কড়চা–আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ জুলাই, ২০১৩
৬. রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্রবোধ–রজত রায়; সাহিত্যশ্রী, ১৩৮৪
৭. রবীন্দ্র-রচনাবলি, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৬
৮. রবীন্দ্রবীক্ষা সংকলন ১৪–শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
৯. রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ–সৈয়দ আকরম হোসেন

সুদীপ্ত সালাম
ফটোগ্রাফার

প্রবন্ধ

# শতবর্ষ পেরিয়ে ‘অগ্নি-বীণা’

**খান মাহবুব**

১৯২১ সালের ডিসেম্বর ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনা ও প্রকাশ করে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সাহিত্য তথা ভারতীয় রাজনীতিতে এক প্রলয় সৃজন করল। লেখকের বাইরের তরুণ সমাজ তাঁকে পাওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি। নজরুলের শুধু এগিয়ে যাওয়ার সময়। একে একে রচিত হলো ‘প্রলয়োল্লাস’, ‘রক্তাম্বরধারিণী মা’ ‘আগমনী’, ‘ধূমকেতু’, ‘কামাল পাশা’ ‘আনোয়ার’, ‘রণভেরী’, ‘শাত-ইল-আরব’, ‘খেয়াপারের তরণী’, ‘কোরবানি’, ‘মোহর্‌রম’। ‘বিদ্রোহী’ তো ছিলই। এসব কবিতামঞ্জরি মলাটবদ্ধ করে বই প্রকাশের অন্তরগরজ ছিল এবং সেই যাত্রার ফলাফলই নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নি-বীণা’ ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশ পায়।

‘অগ্নি-বীণা’ নজরুলের সর্বাপেক্ষা আলোচিত কাব্যগ্রন্থ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপী সামূহিক অবক্ষয় এবং ভারতের স্বাধিকার আকাঙ্ক্ষার রাজনৈতিক আন্দোলন-উদ্দীপনার পটভূমিতে রচিত আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ

পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় সচেতন ভারতবাসী যখন অবতীর্ণ হয়েছে কঠিন সংগ্রামে ঠিক তখনি 'অগ্নি-বীণা'র বিদ্রোহের সুর সূচনা তুললেন নজরুল।

'অগ্নি-বীণা'য় সন্নিবেশিত কবিতা বিবিধ তুল্যগুণে ঋদ্ধ। নজরুল পূর্বযুগে এ রকম সম্ভার বঙ্গসাহিত্যে উঁকি দেয়নি। সাহিত্যে জীবন, জগৎ, ভাবনা, মুক্তি–সবকিছুকে নজরুল যুক্ত করেছিলেন।

নজরুল প্রতিভার পরম বিস্ময়কর দিক হচ্ছে জীবনবোধ। জনগণের দুঃখ-দুর্দশার ফরিয়াদ নিয়ে সমাজের রাষ্ট্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং উদাত্তকণ্ঠে প্রতিকারের দাবি জানালেন।

নজরুল এক ডজন কবিতা 'অগ্নি-বীণা'য় স্থান দিয়ে প্রতিটি কবিতায় আলাদা আলাদা বার্তা দিয়েছেন ভারতবাসীকে তবে সামগ্রিকরূপে প্রতিটি কবিতায় অবয়বকে মূর্ত করে তোলার প্রাকরণিক পরিকল্পনা গ্রহণ, অতীত প্রসঙ্গের সংযোজন, ছন্দের, দ্বন্দ্বের প্রয়োগরীতি, যতি চিহ্নের বিন্যাস–এসব দিক থেকেও আদরণীয় করে তুলেছিলেন 'অগ্নি-বীণা'র প্রতিটি কবিতাকে।

নজরুল কাব্যযাত্রার শুরুতেই সমকালীন গতানুগতিক সাহিত্যের ধারকে ভেঙে দুমড়েমুচড়ে নিজস্ব স্বকীয়তার বিজয়কেতন উড়িয়েছিলেন বলেই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন যুগস্রষ্টারূপে। সর্বোপরি কলোনিশাসিত ভারতবর্ষের 'প্রতিরোধ সাহিত্য' রচনায় যৌক্তিক কারণেই নজরুলের পরিভাষা হয়ে উঠেছে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অভিন্ন ও তুলনারহিত।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছিল ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে। প্রকাশনা সংস্থা হিসেবে নামাঙ্কিত ছিল আর্য্য পাবলিশিং হাউস, (কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা)-এর নাম। 'অগ্নি-বীণা'র প্রকাশের বিজ্ঞাপন ছিল নিম্নরূপ–

'অগ্নি-বীণা' প্রকাশের পর সরকার বাজেয়াপ্ত না করলেও বইটির প্রচার ও বিপণনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

'অগ্নি-বীণা' যখন প্রকাশিত হয় তখন নজরুল জেলে। কিন্তু 'অগ্নি-বীণা'র বারুদের ঝাঁজ গ্রহণ করল অবিভক্ত বঙ্গবাসী। দ্রুত নিঃশেষ হয়ে গেল বই। ২৩ বছরের নজরুল তখন সাহিত্যভুবনের আলোচনার নিউক্লিয়াসে। নজরুল যেমন মূল্যায়িত হয়েছেন অপরিহার্য শক্তির উৎস হিসেবে তেমনি কখনো ডাক উঠেছে নজরুলকে বর্জনের।

'অগ্নি-বীণা'র বিষয় ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় নজরুল কবিতার উপাদান গ্রহণ করেছেন সাধারণ মানুষের জীবন থেকে। দারিদ্র্য, সাম্য, মানুষ, নারী ইত্যাদি এ কথার প্রমাণ বহন করে। 'অগ্নি-বীণা'র সূচিক্রম অনুসারে আলোচনার সূত্রপাত ঘটালে প্রথম দৃষ্টি প্রক্ষেপ 'প্রলয়োল্লাস'–কবিতার উপর। এতে কবির আবেগের সফল প্রতিনিধির অনুরণন ঘটেছে। কবির জীবন প্রভাবে অচলায়তন উত্তরণের যে যাত্রা এবং তার বাড়-বাড়ন্ত গতিময়তা তার প্রকাশ 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায়। সনাতন ধর্মের রূপকল্প ব্যবহার করে কবি একইসঙ্গে সৃষ্টি ও প্রলয়কে তুলে এনেছেন। কবি বলেছেন–

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?–প্রলয় নূতন সৃজন বেদন!
আসছে নবীন–জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!
এই কবিতায় বীররস, রৌদ্ররস অঙ্গীভূত।

নজরুল প্রাণশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বলতে চেয়েছেন ধ্বংস ও প্রলয়ে ভয় নেই। এর মাধ্যমেই আসবে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। নজরুল সেই সম্ভাবনার দিকেই ধাবিত। দেশের জনগণের প্রতি নজরুলের ভরসা ছিল। এজন্যই 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার উপরে নজরুল লিখেছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় 'ভারতবর্ষ'।

'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের সূচিক্রমের দ্বিতীয় কবিতা 'বিদ্রোহী'। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে এক বর্ষণভরা রাতে কলকাতায় 'বিদ্রোহী' রচনা করেছিলেন নজরুল। 'বিদ্রোহী'র তেজ ও ক্ষুরধার শক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে এই কবিতার অন্তর্নিহিত শক্তি সমস্ত ভারতবাসীর হৃৎস্পন্দন তৈরি করে। বিজাতীয় শাসকের রাষ্ট্র হারানোর ভয় তৈরি করেছিল। উপনিবেশ শাসনব্যবস্থায় শাসিত ভারতীয় নাগরিক নজরুল লিখেছেন–

... আমি শাসন–ত্রাসন সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর।
... আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন চিতে চেতন
... আমি বিশ্ব তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব বিজয়-কেতন।
... আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয় !
... আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারো কুর্নিশ।

নজরুলের কবিতার মাধ্যমে এমন উচ্চারণ তৎসময়ের বাস্তবতায় কল্পনাকে হার মানায় অথচ নজরুল বাস্তবে রূপান্তর ঘটিয়েছেন। ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' মুদ্রিত হয়। পত্রিকার প্রচারের সেই সংকটকালে 'বিজলী' পত্রিকা ২৯ হাজার কপি দুইবারে কেবল 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য মুদ্রিত হয়–এটাও ইতিহাসের মণিকোঠায় ঠাঁই নেওয়ার ঘটনা।

'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশপর্বে বিজ্ঞাপনের ভাষাকেও 'বিদ্রোহী'কে ফোকাস করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ভাষা ধূমকেতু, অর্ধ সাপ্তাহিকে ১৯২২ সালের ১১ই আগস্ট (১২২৯ বঙ্গাব্দ ২৬শে শ্রাবণ) সংখ্যায়–

'ধূমকেতু'-সারথি 'বিদ্রোহী'র সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর
কবিতার বই
অগ্নি-বীণা! অগ্নি-বীণা!!
ছাপা হচ্ছে'–দাম এক টাকা।

'অগ্নি-বীণা'র ধারাক্রমের তৃতীয় কবিতা 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতার মূলভাব দেশপ্রেম। তিনি সনাতন-ধর্মাশ্রয়ী বিভিন্ন উপকরণ ও রূপকল্প যেমন শিব, উমা, পার্বতীকে অঙ্কন করেছেন। কবি দেশমাতৃকার রক্ষায় অন্নপূর্ণাকে শক্তিময়ী হতে আহ্বান করেছেন। নজরুল বিভিন্ন রূপকের আড়ালে তৎসমের ভারতবাসীর জাগ্রতকরণে জোর তাগিদ দিয়েছেন। কবির ভাষায়–

'শ্বেত শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।'

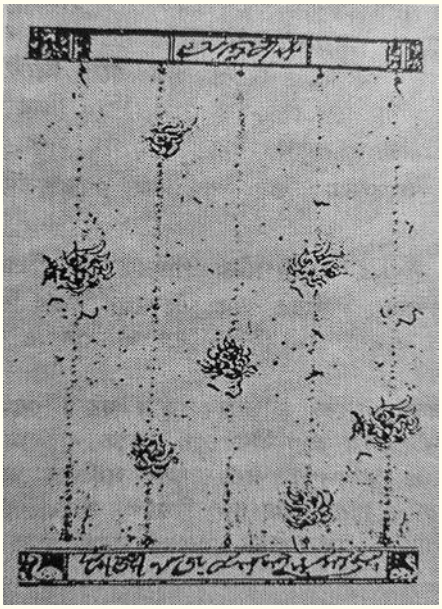

১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'অগ্নি-বীণার' প্রচ্ছদপট পরিকল্পনায় ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এঁকেছিলেন তরুণ চিত্রশিল্পী বীরেশ্বর সেন।

'অগ্নি-বীণা' গ্রন্থভুর্ক্ত কবিতা 'আগমনী'–এর মাধ্যমে পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তির দিশার সন্ধান দিয়েছেন কবি। কবিতার বয়ানে কবি মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন। শিবের শক্তিকে মানুষ্য শক্তিতে রূপান্তর হতে শিব অনুচরদের তাগাদা রয়েছে এতে। 'অগ্নি-বীণা'র প্রতিটি কবিতায় প্রত্নকথা, আদিরস, লোক উপাদান এবং মিথের বিচিত্র অনুষঙ্গের সমাহার লক্ষণীয়। কবির জাগরণের রণহুংকার অন্তরের গভীর বোধ থেকে তাই এত প্রবল ও প্রতাপ। কবির ভাষায়–

হিমালয়! জাগো! ওঠো আজি,
তব সীমা লয় হোক।
ভুলে যাও শোক-চোখে জল ব'ক
শান্তির আজি শান্তি নিলয় এ আলয় হোক !

কবি সবকিছু ভেঙেচুরে শান্তির সর্বশেষ খোঁজ করেছেন। নয়া সমাজব্যবস্থায় নজরুলের আরাধ্য ছিল। নজরুলের ধর্মাশ্রয়ী কোনো অভীলক্ষ্য ছিল না। তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে বাংলার সমাজ সন্তান বলেই জানতেন।

'ধূমকেতু' কবিতা শুধু নয় 'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুলের জীবন এক বাঁক পবির্তনের বার্তাবাহক। 'ধূমকেতু' কবিতার মাধ্যমে নজরুল নবধ্রুপদে হাজির হয়েছেন। মুক্তির নকিব রূপে নজরুল যেন আসলেন,

দেখলেন এবং জয় করলেন। ধূমকেতুতে নজরুল লিখলেন–

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু–
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

ধূমকেতুর মাধ্যমে কবি সবকিছুকে ভেঙে পরাজিত বিশ্বব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছেন। তিনি সমাজ পরিবর্তনে শুধু ডাক দিয়েই থেমে থাকেনি বরং পরিবর্তনের পথনির্দেশও করেছেন। 'ধূমকেতু' কবিতার নামকরণের মতো কবি যেন হাজির। কবির বয়ান–

আমি যুগে যুগে আমি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লবহেতু
এই স্রষ্টা শনি মহাকাল ধূমকেতু।

নজরুল উদ্দীপনাকে কবিতায় বিবিধ ভাগ-বিভাজনে ব্যবহার করেছেন। কখনো বিদ্রোহাত্মক, বিপ্লবাত্মক, চেতনাবহ সাম্যবাদ ইত্যাদি।

'কামাল পাশা' কবিতায় তুরস্ক বীর কামাল পাশার গ্রিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের কাহিনি বর্ণনায় নজরুল বিশ্বে ইসলামি পুনর্জাগরণের ডাক দিয়েছেন। তুরস্কের নব বিপ্লবের নেতা কামাল পাশা কবির মনোভুবনে ত্বরণ সৃষ্টি করেছিল। কবি যেন সেই ঘটনায় ভারতবাসীর জন্য নববার্তার ঈশান কোণের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই নজরুল লিখেছেন–

... দনুজ দলে দলতে দাদা এমনি দামাল কামাল চাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
... আজাদ মানুষ বন্দী করে, অধীনকর স্বাধীন দেশ,
কুল মুলকের কৃষ্টি করে জোর দেখালে ক'দিন বেশ,
মোদের হাতে তুর্কি-নাচন নাচলে তাধিন্ তাধিন্ শেষ!

কামাল পাশা কবিতায় পরাধীনতার বিষাদ থেকে মুক্তির মানসে কবি কামাল পাশাকে আদর্শরূপে মান্য করেছেন। যুদ্ধে শুধু বিজয় নয় নৃশংশতা, বিদ্বেষ, রক্তপাত, পাষণ্ড রূপসহ যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক অজানা বিষয় উঠে এসেছে। নজরুলের পক্ষে এসব বিষয় সম্ভব হয়েছিল কারণ নজরুল নিজেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক ছিলেন। নজরুলের সমকালে কামাল পাশা ভারতীয়দের জন্য মুক্তির আন্দোলনের এক মাইলফলক ছিলো।

'আনোয়ার' কবিতার প্রেক্ষাপট পূর্বতন 'কামাল পাশা' কবিতার ন্যায় তুরস্ক। তবে এবার কেন্দ্রীয় চরিত্র আনোয়ার সেনানায়ক নয় একজন শত্রু হাতে বন্দি সৈনিক। বন্দিদশায় নির্যাতন সহ্য করেও দেশপ্রেম উড্ডীন রাখার চিত্রের বর্ণনা রয়েছে এখানে। একইসঙ্গে ভারতবাসী স্বাধীনতাকামীদের জন্য একটা অনুকরণীয় মডেল হিসেবেও নজরুল তুলে এনেছেন। নজরুল লিখেছেন–

সব যদি সুম্‌সাম, তুমি কেন কাঁদ আর?
দুনিয়াতে মুসলিম আজ পোষা জানোয়ার!
আনোয়ার! আর না !–
দিল কাঁপে কার না?

কবি যেন আনোয়ারের জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন। এজন্যই বন্দিদশা থেকেই প্রতাপ ও পরাক্রমহীন ভারতবাসীকে ধিক্কার দিচ্ছে, গালমন্দ করে উজ্জীবিত করার প্রাণান্তর চেষ্টা করছে।

'রণ-ভেরী' কবিতার একটি সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট রয়েছে। গ্রিসের বিরুদ্ধে আঙ্গোরা তুর্ক গভর্নমেন্ট যে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন সেই যুদ্ধে কামাল পাশার সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে দশ হাজার স্বেচ্ছা সৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব শুনিয়া লিখিত। এই কবিতা 'অগ্নি-বীণা'র পূর্বতন দুটি কবিতা 'কামালপাশা' ও 'আনোয়ার'–এর অনেকাংশে সম্পূরক। মুসলিম বিশ্বের গৌরব হারিয়ে নজরুল কেবল বেদনাহত হননি পাশাপাশি হৃদগৌরবের পুনরুদ্ধারে রয়েছে স্বপ্রতিভ তাগিদ।

রণ-ভেরীতে নজরুল সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে আরবি ফারসি শব্দের মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়েছেন। যেমন : খুন-গৈরিক বাস গায়। নজরুল আরও লিখেছেন–

মোরা 'দিলাবার খাঁড়া তলোয়ার হাতে আমাদেরি শোভা পায়,
তারা খিঞ্জির যারা জিঞ্জির-গলে ভূমি চুমি মুরছায়।'

নজরুল অবধারিতভাবে বিশ্বাস করতেন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই ভারতবাসীর গৌরব পুনরুদ্ধার সম্ভব। তাই কবিতার প্রতি চরণে সেই অগ্নিবারুদ শোভা পেয়েছে। 'শাত-ইল-আরব' কবিতার প্রেক্ষাপট গভীর ও বিস্তৃত। শাত-ইল-আরব পশ্চিম এশিয়ার দীর্ঘতম নদী। তবে নজরুল কবিতার মাধ্যমে বোধকরি শাত-ইল-আরব বঙ্গবাসীর কাছে লোকপ্রিয় হয়েছে। এই নদীকে কেন্দ্র করে ঘটনাপ্রবাহ বিশেষত আরব জাহানের গতি প্রতিচ্ছবি আলোচনার আবর্তে নজরুলের ইতিহাস চেতনার সাথে পরাধীনতার বেদনাকথন বর্ণিত হয়েছে।

'শাত-ইল-আরব নদী তীরে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে। নজরুল নদীতটে যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। কবির ভাষায়–

গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত–'শক্তি দিয়েছে গোস্তাখির!'
দজ্‌লা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল! পূর্ত যুগে যুগে তোমার তীর।

কবি আর বেদুঈনকে মুক্ততার প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং এর মাধ্যমে ইতিহাসের পাঠ রচনা করেছেন। একইসঙ্গে সৌন্দর্যপিপাসু নজরুল আরবের গোলাপ ও খেজুরের পরিচয়ও তুলে এনেছেন।

'খেয়াপারের তরণী' কবিতার রচনার প্রেক্ষপট ভিন্নধর্মী ও চমকপ্রদ। ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খান বাহাদুর মুহম্মদ আযমের স্ত্রীর আঁকা একখানা নৌকার পরিচয় লিখতে গিয়ে বিস্তৃত পরিসরে নজরুল 'খেয়াপারের তরণী' কবিতা রচনা করেন। 'খেয়াপারের তরণী' নজরুলের স্বকীয় কলাকৌশল অপূর্ব সৃষ্টি হলেও এ কথা মানতেই হবে যে এই সৃষ্টির ভিত্তি বেগম আযমের সৃষ্টির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই কবিতার কথাগুলো বেগম আযমের ছবি হতে বের হয়ে এসেছে।

'কোরবানী' কবিতা ইসলাম ধর্মের একটি প্রধান রীতিকে আশ্রয় করে এই কবিতার বুনন রচিত। কোরবানির ত্যাগের মহামান্বিত দিক থেকে ইসলামপন্থিদের বিচ্যুত হয়েছে সে বিষয়টি নজরুল তুলে এনেছেন। তৎসময়ে কোরবানি ত্যাগের চেয়ে বড়ো হয়েছিল যেন মাংস ভক্ষণ সে বিষয় তিনি তুলে এনেছেন। একই সাথে মুসলিমদের গতানুগতিক জীবন বোধ ও রীতির সাম্যতা বিশেষত কুসংস্কার থেকে বের হতে তাগিদ দিয়েছেন। কবিতার চরণে–

... 'ইব্‌রাহিম আজ কোরবানি কর শ্রেষ্ঠ পুত্রধন!'
হত্যা আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!
... আজ জল্লাদ নয়, প্রহ্লাদ-সম মোল্লা খুন-বদন।
হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন।

'মোহর্‌রম' 'অগ্নি-বীণা'র শেষ কবিতা। এটিই মুসলমানদের ধর্মীয় ঘটনা প্রবাহের এক প্রধানতম স্মারককে উপজীব্য করে রচিত। কারবালার বিষাদপূর্ণ কাহিনি এ কবিতার মূল উপজীব্য।

কবিতাটির প্রথম দুই চরণ–

নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া
আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া

কবিতার শুরুতেই নীল আকাশের রং সিয়া বা কৃষ্ণবর্ণ, যা শোকের রং, কিন্তু দুনিয়ার রং লাল, যা কারবালার রক্তের রং। নবি হজরত মোহাম্মদ (সা.) কন্যা ফাতেমার পুত্র ইমাম হোসেন কবিতার দ্বিতীয় লাইনে তার প্রতি নিবেদনে বলা হয়েছে–'আম্মা' লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।" কারবালার নিষ্ঠুর শোকাবহ ঘটনার প্রকৃতিও যে মুহ্যমান, মীর মশার্‌রফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' তে সে চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। নজরুলের কবিতার দৃশ্য ও ধ্বনিরূপময় চিত্রকল্পে তারই প্রকাশ।

নজরুল 'মোহর্‌রম'-এর চিত্রকল্পে ভাষার যে ব্যঞ্জন সৃষ্টি করেছেন তা কারবালার বিয়োগগাথাকে আরও মহিমান্বিত করেছেন।

প্রথম যুদ্ধের পর করাচির সৈনিক ব্যারাক থেকে কলিকাতার নজরুলের প্রত্যাগমন ১৯২০-এ। রাজনীতিসচেতন কবি সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেননি। কারণ নজরুল বিশ্বাস করতেন তখনো ভারতে কোনো মৌল রাজনৈতিক দর্শন বেড়ে ওঠেনি। নজরুল নিজে রাজনীতিতে যোগ না দিলেও সর্বাবস্থায় সেকাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। 'অগ্নি-বীণা'-এর চাক্ষুষ প্রমাণক। •

**খান মাহবুব**
প্রাবন্ধিক ও গবেষক
খণ্ডকালীন শিক্ষক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অলংকরণ : মিজান স্বপন

ছোটগল্প

# অমৃতস্য পুত্রাঃ

## কুমার অরবিন্দ

হিজল গাছটাকে কেন্দ্রে রেখে মাঠের ওপারের গ্রামগুলো একটা পরিধি নির্মাণ করেছে। গাছটাকে মাঠ এবং গ্রামগুলোর ভরকেন্দ্রও বলা যেতে পারে। গাছটার বয়স আন্দাজ করে অনেকেই বলেন তিন-চারশ বছর। কেউ কেউ বলেন আরও বেশি। গাছটার মধ্যে একধরনের মায়া আছে, একটা শান্ত-শ্রী ভাব আছে। এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বীরা গাছটাকে পবিত্র মনে করে এখানে কিছু মাঙ্গলিক কাজ করেন। অন্নপ্রাশন ও চৈত্র সংক্রান্তির মেলা তার মধ্যে অন্যতম। গাছটার পাশ দিয়ে মামাবাড়ি যাওয়ার সময় মা বলতেন, তুই এই হিজলার নিচে বসে প্রথম ভাত খাইছিলি।

বর্ষীয়ান হিজল গাছটিকে এলাকার মানুষ আদর করে হিজলা বলে ডাকে। কবে এ নামরকরণ হয়েছিল সেটা জানতে হলে ইতিহাসবেত্তার দ্বারস্থ হতে হবে। আমাদের একটা জমি আছে হিজলার পাশে

বাবা-কাকারা জমিটাতে কাজ করতে এলে আমরা খাবার নিয়ে আসতাম। মাঠে কাজ করতে আসা কৃষকগণ কাজের ফাঁকে হিজলার শীতল ছায়ায় বসে জিরিয়ে নেন, এখানে বসেই দুপুরের খাবার খান। এলাকার চেয়ারম্যান সাহেব গতবছর একটা টিউবওয়েল বসিয়েছেন। পানের জন্য এখন আর দূর গ্রাম থেকে জল টেনে আনতে হয় না।

হিজলার চারপাশে প্রকৃতি সবুজ কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে। মাঝেমধ্যে দমকা বাতাসে কচি পাটের চারাগুলো প্রথমস্পর্শ পাওয়া কিশোরীর মতো কেঁপে উঠলে সবুজ কার্পেটেও সেই কাঁপন লাগে। একই ভূমিজঠরে জন্ম নিলেও চারাপাটগুলোকে নির্বিঘ্নে বাড়ার জন্য এখন প্রথম নিড়ানি দেওয়া হচ্ছে। হিজলার চারপাশে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মানুষগুলো উবু হয়ে সবুজের ভেতর থেকে সবুজ বেছে পরিষ্কার করছেন। কৃষকদের এ এক বিমাতাসুলভ আচরণ! যাদেরকে আগাছা ভেবে উপড়ে ফেলা হচ্ছে তারা কি সত্যি আগছা? নাকি তাদের কাছে পাটের চারাগুলো আগাছা, তাদের বেড়ে ওঠার অন্তরায়!

বাবার জন্য আমি খাবার নিয়ে এসেছি। অনেকদিন পরে হিজলার কাছে এলাম। সর্বশেষ এসেছিলাম বছর দুয়েক আগে। ঢাকায় পড়তে যাওয়ার পর এখানে তেমন আসা হয় না। বাবাকে খেতে দিয়ে হিজলার গায়ে আমি হাত বুলাই। তার বাকলগুলো আগের চেয়ে আরও কালচে হয়েছে, আরও কিছুটা খড়খড়ে হয়েছে। ডালে ডালে আরও পাখি নতুন বসতি গড়েছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে মঙ্গল কামনায় হিজলার গায়ে সিঁদুর মাখানো হয়েছিল। বাকলের ভাঁজে ভাঁজে তার কিছুটা এখনো অবশিষ্ট আছে। গাছের কাণ্ডে-ডালে বাঁধা কিছু রঙিন সুতো ঝুলে পড়ে বাতাসকে নিয়মিত উৎসাহ প্রদান করছে। জ্যৈষ্ঠের বর্ধিষ্ণু দুপুর। প্রচণ্ড দাবদাহ শোষণ করে শীতলশান্তি বর্ষণ করছে হিজলা।

এলাকায় প্রচলিত আছে হিজলার নিচে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন তাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাঁরা অমর হন। সেই সৌভাগ্য অবশ্য সবার হয় না। আমার জীবদ্দশায় একজনের মাত্র হিজলার নিচে মৃত্যু হয়েছে বলে শুনেছি। কালবৈশাখী ঝড়ে তিনি গাছটার নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাজ পড়ে মারা গিয়েছিলেন। বহুকাল আগে এলাকায় কেউ মুমূর্ষু হলে বা প্রাণ ওষ্ঠাগত হলে তাকে হিজলার নিচে নিয়ে আসা হতো। হিজলার নিচে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে যদি তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়!

খাবার খাওয়ার পর কৃষিজীবী মানুষগুলো খোশগল্পে মেতে ওঠেন। ছেলেমেয়েদের বিয়ের গল্প থেকে শুরু করে ক্রিকেট-ফুটবল, স্থানীয় রাজনীতি-বিশ্বরাজনীতি কোনোটাই বাদ যায় না। কিন্তু এসব গল্পে আমার মন বসে না। আমার কেবলই মনে হতে থাকে শতশত বছর ধরে গাছটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। কতকিছু দেখেছে, কত কি অনুভব করেছে, কত মানুষ তার শান্ত ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে, গল্প করেছে! কাকে শোনানোর জন্য শত বছরের সেসব গল্প সে তার কোষ গহ্বরে জমা রেখেছে? তারও নিশ্চয়ই কত কি বলার আছে। নীরব নিশীথে অথবা নির্জন দুপুরে তার মনের কথা সে কাকে জানায়? অনতিদূরে অথবা হাজার মাইল দূরে অথবা তারও দূরে তারই এক স্বজাতি দাবানলে পুড়লে বা করাতের আঘাতে দেহকাণ্ড ছিন্নভিন্ন হলে সে কি খবর পায়? ব্যথায় তার বুক কাঁপে? আহা! আচার্য জগদীশ বোস যদি এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করতেন যা দিয়ে গাছের কথা শোনা যেত বা বোঝা যেত! কোনোদিন কোনো মহাত্মা যদি এমন যন্ত্র বানিয়ে ফেলেন সেদিন থেকে পৃথিবীর সত্য ইতিহাস লেখা হবে। এই মহাপ্রাণ বৃক্ষরাজি কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। তখন মানুষের অহংকার আর মিথ্যার বেসাতি বন্ধ হবে।

হিজলাকে আধাকিলোমিটার দূরে রেখে মাঠের পুবদিক থেকে পশ্চিমদিকে একটা রাস্তা গিয়েছে। নৈঋত কোণ ধরে একজন হেঁটে আসছেন। পথ কমানোর জন্য তিনি রাস্তা ছেড়ে মাঠের মাঝ বরাবর আসছেন। তাঁর হাঁটার গতি শ্লথ। কাঁধে একটা ঝোলা। বয়সের ভারে নাকি ঝোলার ভারে তিনি ন্যুব্জ বোঝা যাচ্ছে না। লোকটা হিজলার নিচে এসে থামেন। ঝোলাটা নামিয়ে রাখেন। তিনি ঘেমে নেয়ে উঠেছেন। বয়স সত্তরোর্ধ হবে, অশীতিপরও হতে পারেন। মাথার চুলগুলো ফিনফিনে সাদা। সামনের চুলগুলো পড়ে কপাল বড় হয়েছে। পেছনের চুলগুলো অবশ্য ঘাড় পর্যন্ত বেয়ে পড়েছে। কপালে ও চাঁদিতে ছোপ ছোপ কালচে দাগ আটালির মতো সেঁটে আছে। তাঁর দুই চোয়ালকে দুই তর্জনির চাপে বিরাগবশত কেউ ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। হাত-পায়ের আঙুলগুলো কালচে-শীর্ণ। চামরা কুঁচকে গিয়েছে। তাঁর নিম্নাঙ্গের ধুতি উঠে এসেছে হাঁটুঅবধি। ঊর্ধ্বাঙ্গে ছিন্ন ফতুয়া। ঘোলাটে চোখ দুটো কোটরে ঢুকানো, তবুও তাঁর দৃষ্টি স্থির। প্রজ্ঞায় ভাস্বর। এই বিভীষিকাময় গরমে তিনি এতটা পথ খালি পায়ে এসেছেন!

লোকটা সহজেই উপস্থিত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, আপনারা কিছু মনে না করলে একটু জিরিয়ে নিই, বাবারা। টিউবওয়েল দেখে এগিয়ে যান। জল খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে আমি প্লাস্টিকের গ্লাস ভরে জল দিই। তিনি একগ্লাস খেয়ে আরেক গ্লাস চোখেমুখে ও মাথায় ছিটিয়ে নেন।

হরু জ্যাঠা জিজ্ঞেস করেন, কোত্থেকে এলেন, মশাই? আগে তো আপনাকে এদিকে দেখি নাই।

জ্যাঠার কথায় লোকটা স্মিত হাসেন। হাঁটু গেড়ে বসে আরেকটু নিচু হয়ে ধুতির কোনা দিয়ে মুখ মোছেন। আমার কোনো বাড়িঘর নাই, বাবা। সেই ছোটবেলা দ্যাশান্তরি হইছি। এ দ্যাশ থেকে সে দ্যাশ ঘুরে বেড়াই। মন্দির-মসজিদ, আখড়ায় রাত কাটাই। আর ভালোবেসে যে যা খাতি দেয় তাই খাই। আমার কোনো ছুঁৎমার্গ নাই।

হরু জ্যাঠা আবার বলেন, সংসার আছে না?

যে দ্যাশান্তরি হয় তাঁর কি আর নির্দিষ্ট সংসার হয়, বাবা? পুরো জগৎটাই তাঁর সংসার। আমারও তাই। ঘুরে ঘুরে এই সংসারটা দেখি, গাছপালা দেখি, নদীনালা দেখি, আর দেখি মানুষ। তয় সুযোগ পালি সাধুসঙ্গ করি। এই আমার কাজ, এই আমার ব্রত। ক্লান্তি লাগলি গাছতলায় জিরাই, আবার হাঁটি। খিদে লাগলি কারোর কাছ থেকে কিছু চেয়ে খাই। শরীর তো গেছে। এখন আর আগের মতো কাজ করতে পারি না। যৌবনে মানুষের বাড়ি বাড়ি কামলা দিছি। মানুষের ধান কাটছি, পাট ধুইছি। তাঁরা যা দেছে তা পকেটে নিয়ে আবার বের হইছি। টাকা শেষ হলি আবার কাজ করছি। নৌকায় জেলেদের সাথে মাছ ধরছি, কামারের সাথে লোহা পিটায়ে কাস্তে বানাইছি। মানুষের সাথে মিশছি, তাদের ভেতরের মানুষটারে দেখছি।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করেন, কোন কোন দেশ ঘুরছেন, কাকা?

দ্যাশ ঘুরিতি গেলিও তো এখন পাসপোর্ট-ভিসা লাগে, বাবা। আমি তা কনে পাবো? তয় ভারতবর্ষের প্রায় সব তীর্থক্ষেত্র ঘুরছি। এখন আসছি নিজ দেশে। নিজির জন্মভূমিকে আবার একটু মনভরে দেখার ইচ্ছে আছে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, বলে তিনি দুইহাত জোর করে কপালে ঠেকান।

অল্পসময়ের মধ্যেই লোকটা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন। সবাই তাঁর কথা মন দিয়ে শুনছেন। এই লোকটাও এই হিজল গাছটার মতো। হাজার হাজার মানুষের গল্প, কতশত নদনদীর গল্প, পাহাড়-পর্বতের গল্প তিনি করোটিতে ধারণ করে আছেন। কথা বলতে বলতেই লোকটার মুখ থেকে ক্লান্তির ছাপ দূরীভূত হয়েছে। একধরনের প্রশান্তি তাঁর চোখেমুখে খেলা করছে। পৃথিবীতে যিনি নির্লোভ তিনি নির্বিরোধ, তিনিই সুখী। যার চাহিদা নেই তিনিই কেবল এমন স্বস্তির গল্প শোনাতে পারেন। লোকটাকে দেখে আমার ঈর্ষা হয়। আহা! এমন একটা জীবন যদি আমিও যাপন করতে পারতাম। আমারও মাঝেমধ্যে সব ছেড়ে গৌতম বুদ্ধের মতো বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। এই লোকটাকে দেখে সেই বাসনা আমার তীব্রতর হয়।

লোকটা বলতে থাকেন, আমি অশিক্ষিত মানুষ, বাবা। স্কুল-কলেজের বারান্দা পার হয়নি। তয় এতটুকু বুঝতি পারি–মানুষই সব। 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি/ মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি।' আরেক গানে লালন সাঁই বলেছেন–'সহজ মানুষ ভজে দেখনারে মন দিব্যজ্ঞানে/ পাবিরে অমূল্য নিধি বর্তমানে/ ভজ মানুষের চরণ দুটি/ নিত্য বস্তু পাবি খাঁটি।' এই মানুষের মধ্যেই সেই পরম পুরুষ, সেই আলেক সাঁই বিরাজ করতিছেন। মানুষ হইলো গিয়ে আশরাফুল মাখলুকাত।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, কিন্তু মানুষই তো যত নষ্টের গোঁড়া, সব ঝঞ্ঝাটের মূল।

লোকটা আবার সেই নির্মল হাসি হাসেন। কথাটা সত্যও নয়, আবার

লোকগুলো যখন ঝোলা খুঁজতে ব্যস্ত আমি তখন মাথার ফাটা অংশ গামছা দিয়ে চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করি। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাব তার উপায় নেই। টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে বৃদ্ধের মাথায় দিতে থাকি। বুঝতে পারি মাথায় জল দেওয়া বৃথা। হরু জ্যাঠা নাড়ি দেখে মাথা নাড়েন

একেবারে মিথ্যাও নয়। মানুষের দ্বারা খারাপ হয় বটে, আবার মানুষ না থাকলে ভালোর খোঁজও তুমি পেতে না, বাবা। লোকটা ওপরের দিকে তাকান, মানুষের মাধ্যমেই তো অই মহাজন তাঁর নিজের খোঁজ দিছেন। মানুষ না থাকলে তিনার খোঁজ দিতো কেডায়? মানুষ হইলো অমৃতস্য পুত্রাঃ অমৃতের সন্তান। মানুষরে অবহেলা করলি চলে না, বাবা।

লোকটার কথার মধ্যে একধরনের মুগ্ধতা আছে। বাবাকে বলে লোকটাকে আজ বাড়ি নিয়ে গেলে কেমন হয়? রাতে অনেক গল্প শোনা যাবে।

লোকটা যেদিক থেকে আসছিলেন সেদিক থেকে একদল লোক দৌড়াতে দৌড়াতে হিজলার দিকে আসছে। সবার নজর এবার লোকগুলোর দিকে। লোকগুলো হিজলার নিচে এসে থামে। বৃদ্ধ লোকটিকে দেখিয়ে বলে–এই যে ইনি, সেই চোর!

দলের মধ্যে টাকমাথার ষণ্ডা মতো লোকটা বৃদ্ধের ঝোলাটা কেড়ে নিতে চায়। বৃদ্ধ সেটাকে আগলে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বাবা এতক্ষণ মন দিয়ে বৃদ্ধের কথা শুনছিলেন। হঠাৎ কোত্থেকে লোকগুলো এসে বৃদ্ধকে চোর বলছে! আবার তাঁর ঝোলা নিয়ে টানাটানি করছে! বাবা বললেন, আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

তাদের কথায় যা বোঝা গেলো তার মানে এই–লোকটা কিছুক্ষণ আগে তাদের গ্রামে ছিল। এক বাড়িতে বসে খাবার খেয়েছে। কিন্তু লোকটা এতবড় চোর যে, বাচ্চা একটা মেয়ের গলা থেকে সোনার চেইন আর একটা কাঁসার বাটি নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

এতক্ষণ যে মানুষটাকে আমি চিনেছি সেই মানুষটার সাথে এই কথাগুলো যায় না। আমি বৃদ্ধের দিকে তাকাই। ব্যথায় চুপসে গেছে মুখ, অবিশ্বাসে তাঁর চোখ দুটো ছলছল করছে, অপমানে সারা গা কাঁপছে। এই লোকগুলো যা বলছে তা কিছুতেই সত্য হতে পারে না। ওদের কথা আমার একবিন্দু বিশ্বাস হচ্ছে না।

আপনাদের কাছে কোনো প্রমাণ আছে যে ইনিই চেইনটা নিয়েছেন? আমার গলা থেকে এতক্ষণে কথা বের হয়।

আমার প্রশ্নে টাকমাথা আমার দিকে তাকায়। গলার রগ ফুলিয়ে বলে, আমার মেয়ের গলা থেকে চেইন এই চোরটাই নিয়েছে। দেখে মুরুব্বি মনে হয় কিন্তু এ হাড়পাকা শয়তান।

প্রমাণিত হওয়ার আগেই একজনকে আপনারা চোর বলতেছেন?

আমার কথা শেষ হতে না হতেই টাকমাথা কর্কশ গলায় বলে, তোমার বিশ্বাস না হলে উনার ঝোলা খুলে দেখো। চেইনের সাথে একটা কাঁসার বাটিও পাবা। আমার বউ-ই দেখছে ঝোলার মধ্যে কিছু রাখতে। কিন্তু সে তো তখন বোঝে নাই ভেতরে কি রাখছে। পরে খেয়াল করে দেখে মেয়ের গলায় সোনার চেইনটা নাই!

হরু জ্যাঠা সবাইকে থামতে বলেন। লোকগুলোর উদ্দেশে বলেন, উনি যদি আপনাদের জিনিস নিয়েই থাকেন তাহলে আপনারা তা ফেরত পাবেন।

এখনই বের করে দিতে বলেন, নইলে শালার মাথা...।

হরু জ্যাঠা বৃদ্ধকে বলেন, কাকা, সবই তো শুনছেন। আপনার ঝোলাটা উনাদের একটু খুলে দেখান। বৃদ্ধ চোখ তুলে জ্যাঠার দিকে তাকান। মানুষের প্রতি তাঁর যে অগাধ বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাস হারানোর ভয় তাঁর চোখে। তিনি বলেন, বাবারা, আপনারাও কি বিশ্বাস করেন আমি চোর?

জ্যাঠা মাথা নাড়েন, না। কিন্তু কথাডা যখন উঠছে...।

আমার ঝোলার মধ্যে আমার নিজির জিনিসপত্র ছাড়া আর কিছু নাই, বাবা। আপনারা যদি এমনিতে দেখতে চাইতেন আমি আপনাদের হাতে ঝোলাটা তুলে দিতাম। কিন্তু আমাকে চোর সাব্যস্ত করে আমার ঝোলা আপনারা দেখবেন তা হতি পারে না। আমার কথাকে আপনারা বিশ্বাস করতি পারতেছেন না। আমি চুরি করতে পারি এই সন্দেহটা আমারে নিয়ে আপনারা করতেছেন!

লোকগুলো এবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দেখছেন, চোর শালা আবার বড় বড় বাতেলা দিতেছে। টাকমাথা ষণ্ডাটা বৃদ্ধের কাছ থেকে ঝোলাটা ছিনিয়ে আনতে যায়। বৃদ্ধ বুকের সাথে ঝোলাটা চেপে ধরে রাখেন। টানাহেঁচড়ার মধ্যেই একজন হিজলার একটা পরে থাকা ডাল দিয়ে বৃদ্ধের মাথায় সপাটে বাড়ি দেয়।

ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। আমার চোখের সামনে মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় ঘটনাটা। বৃদ্ধ আর বসে থাকতে পারেন না, পড়ে যান মাটিতে। লোকগুলো বৃদ্ধের ঝোলাটা খোলে। ঝোলার মধ্য থেকে একটা ছেঁড়া গামছা, আধময়লা একটা ধুতি, একটা হাফ শার্ট, কয়েকটি ধর্মীয় বই, কয়েকশ টাকা, একটা ঘটি, আর একটা পেতলের পুরাতন বাটি বের হয়।

হরু জ্যাঠা ক্ষিপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, এটা আপনাদের বাটি?

টাকমাথা মাথা নাড়ে। তাদের বাটিটা নতুন। কিন্তু তারা খোঁজা বাদ দেয় না, তন্নতন্ন করে খোঁজে। অথচ তাদের হারানো কোনো কিছুই বৃদ্ধের ঝোলার মধ্যে পাওয়া যায় না।

লোকগুলো যখন ঝোলা খুঁজতে ব্যস্ত আমি তখন মাথার ফাটা অংশ গামছা দিয়ে চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করি। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাব তার উপায় নেই। টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে বৃদ্ধের মাথায় দিতে থাকি। বুঝতে পারি মাথায় জল দেওয়া বৃথা। হরু জ্যাঠা নাড়ি দেখে মাথা নাড়েন। বলেন, নাই...।

কুমার অরবিন্দ
কথাসাহিত্যিক

আমার দুচোখ ভেঙে জল গড়াতে চায়, বুকের মধ্যে কান্না গুমরে ওঠে। আমি চোখের জল লুকাতে হিজলার দিকে তাকাই। যে লোকটা মানুষকে অমৃতের সন্তান ভাবতেন তাঁর প্রতি পুঙ্গবদের এহেন অত্যাচার দেখে তবুও বুড়ি হিজলা স্থির! এমন অনাচারে সে ফেটে চৌচির হলো না! লোকটা সারাজীবন যে বিশ্বাসকে ধারণ করে ঘুরেছেন, যে বিশ্বাসের খোঁজ তিনি পেয়েছিলেন বলে তৃপ্তি পেতেন মৃত্যু দিয়ে সেই বিশ্বাসকে তিনি মিথ্যা প্রমাণ করে গেলেন!

**আপনার মতামত জানান**

যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল

ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯

এক্সটেনশন : ১১৪২

inf2.dhaka@mea.gov.in

ভারত বিচিত্রায় ব্যবহৃত বেশকিছু ছবি ও অলংকরণ ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভারত বিচিত্রা বিক্রয়ের জন্য নয়

## মলয় রায়চৌধুরী
# রাবণের চোখ

শৈশবের কথা। সদ্যপ্রসূত কালো ছাগলির গা থেকে
রক্ত-ক্বাথ পুঁছে দিতে-দিতে বলেছিল কুলসুম আপা
'এভাবেই প্রাণ আসে পৃথিবীতে; আমরাও এসেছি
একইভাবে'। হাঁস-মুরগির ঘরে নিয়ে গিয়ে আপা
আমার বাঁ-হাতখানা নিজের তপ্ত তুরুপে চেপে
বলেছিল, 'মানুষ জন্মায় এই সিন্দুকের ডালা খুলে।'

রাবণের দশজোড়া চোখে আমি ও-সিন্দুক
আতঙ্কিত রুদ্ধশ্বাসে দ্রুত খুলে বন্ধ করে দিই।

## কাজল চক্রবর্তী
# আগামী পৃথিবী

কেউ যাবেনা ফিরে, থাকবে সবাই– থাকার মতো
সূর্য দ্যাখে, বরফে কাঁপে–আমেরিকাতে তবুও থাকে
সামান্যতম চিন্তার ছায়া বেঁচে থাকবার
দেখিনি কোথাও, কেউ বলেছে উদার হাতে
সরকার নাকি মাসোহারা দ্যায়। প্রচণ্ড শীতে
গৃহহীনদের গৃহ দেওয়া হয়। তারা বেশ আছে–

দূর থেকে সব পাখিকেই প্রায় এক লাগে
কাছে এলে তবে বোঝা যায় তার বর্ণ এবং
সারা পৃথিবীর মানুষ এখানে ভিড় করে আছে
বেঁচে থাকবার সুখের আশায়। তবে কী এখন
অনেক অসুখে মেঘ ভেসে আসে, এখানেই আসে
আকাশ থেকে সমতলে নামে, বর্ণ হারায়
এভাবেই এক নতুন শ্রেণির বেড়ে ওঠা শুধু
এই শ্রেণিজরা মুক্ত করবে আমাদের যত
ধর্মের বাধা, ভাষার কাহিনি, হীন প্রাণকথা
ভেসে যাবে আগামী পৃথিবী নতুন ভাবধারাতে

## বীরেন মুখার্জী
# জীবনের সব গল্পে অপলক আমি

সামান্য এ রাত ঝরে পড়ে বৃষ্টির সমান্তরাল
আর তোমরা চাও শাদাভাত হয়ে ফুটতে
ক্ষোভ ও সংকেতের ভাষামুগ্ধ গভীর বৃষ্টিবনে;
অথচ, খেয়াল করো-মৌনপ্রধান এই দেশে
কোনো দার্শনিক পাখির ওড়াউড়ি নাই!

মাছেদের ক্লাসে তোমরা যখন উড়ন্ত ট্রেনের গল্প
বলো, সেখানেও জায়মান দেখি ক্ষুধার হাতছানি
তাই তোমরা আমাকে গুজব-গুজব মান্য করো
কলঙ্ক ও কঙ্কালের নাভিমূলে সুন্দর বাজিয়ে
নীরবে পার হয়ে যেতে বলো শতাব্দী-পাহাড়

জীবনের সব গল্পে অপলক আমি-কিঞ্চিত বুনিয়াদি,
তবু এই ঝিরিরাত নিদ্রাসুখের বিপরীতেই খোলে।

## সুশীল মণ্ডল
# কবির চিঠি পড়ে জেনেছি

কবির চিঠি পড়ে জেনেছি
ভালোবাসার আবর্তে পৃথিবী ঘুরছে
বৃষ্টিতে চুপ্পুস হয়ে যে মেয়েটি
চেনা বৃত্তের বাইরে বাইরে ঘোরে
সে আসলে বিষণ্ন প্রেম।

আকাশ নদীতে আর মুখ ডোবায় না
হলুদমাখা বিকেল ভিক্টোরিয়ার দেয়ালে
ঠোক্কর খেয়ে মিশে যায় ছাইরঙা সরোবরের জলে।
কবির চিঠি জানাতে ভোলেনি
সময় হলে, মহাকাল আমাদের শীতল বুকে
পা তুলে দাঁড়ায়।

কবির চিঠি পড়ে জেনেছি
একদিন সকল সম্পর্ক পুরোনো বাড়ির মতো
ধসে পড়ে, এমনকি মায়া
সকল প্রসন্নতা ঝেড়ে ফেলে
একটুও দাগ রাখতে নারাজ।

## বিপ্লব রায়
# গণিত

কোনো এক প্রাণের মৌলিকে আমি অবিভাজ্য নই
ভাজ্য আর ভাজকের খেলায়।
হৃদয়ে অসংখ্য গণিত–
তবু আমি গ্রাফপেপার নই।
আমার উত্থান-পতন ঘিরে অজস্র ডাটাবেজ,
লোকনিন্দা, কিন্তু আমি দেবতা নই।

কতকাল বেঁচে আছি বর্গাকার বেদনার ঘরে
তুমি কোন পীথাগোরাস দিয়ে যাচ্ছ সমকোণী লোভ!
কেন্দ্র ফুঁড়ে চলে যাচ্ছে বহুগামী ব্যাসের ধারণা।

তবু, আমাকেই ফিরে আসতে হবে প্যারাবোলা
এই সংসারে।

গণিতের দিদিমণি শোনো,
হৃদয়ের সঠিক কোনো স্থানাঙ্ক নেই।

## শৈলজানন্দ রায়
# আন্তঃনগর ট্রেন

পারমুটেশান এবং কম্বিনেশনের মধ্যে যে সামান্য তৃষ্ণাকাতর ভৌতদূরত্ব তার মাঝ দিয়ে অনায়াসে যেতে পারে আন্তঃনগর ট্রেন! সেই ট্রেনের ছাদে দাঁড়ালে ক্ষুদ্র পরিবর্তন মনে হয়–পৃথিবীটা মোটেই গোলাকার নয়, বরং বাঁশের মতো ছিপছিপে লম্বা আর জোছনার মতো গতিশীল।

ধরো, সেই না-পরিবর্তনের মতো সামান্য পরিবর্তনটুকুই ডেল এক্স। অথচ আজ ধনাত্মক পরিবর্তন নিয়ে কী মারাত্মক শ্রম, প্রদর্শনী আর মিছিল!

কোনো এক ভোরের স্বপ্নে ভ্রম হতে পারে–কারো যাবার জন্যে বুক ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু যেতে পারছে না। ট্রেনটি তীব্র একটা অগাণিতিক বাঁশি বাজিয়ে ডাকছে–যে গন্তব্যে যেতে চাও সে আসতে পারো।

## মাহফুজ আল-হোসেন

# নেমেসিস

অনাক্রান্ত হৃদ-পাষাণ
এখন অনেকটাই অপ্রার্থিত
অলীক মুক্তির জমজমাট রঙ্গমঞ্চ!

জোড়া ইলিশের প্রসূতি ঘ্রাণ–
হঠাৎ ছড়িয়ে পড়েছে লোনা
শরীরের বিপদসীমা অতিক্রম করে।

নির্বিবাদীর তকমাটা ধরে রাখতে
একটার পর একটা স্নায়ুক্ষয়ী দ্বৈরথ
ধেয়ে আসছে,
প্রতি-পলকের মধ্যবিরতিতে।

মনোরঞ্জক সান্ধ্য-সূচির কোলাহলে
তুমি কি এক  দ্বিধাগ্রস্ত দর্শক নও?
মহাকাব্যিক একাঙ্কিকার মাঝপথে এসে
বলো তো, কি খুঁজছ তুমি স্ববিনাশী
নিরপেক্ষতার অপরিচ্ছন্ন গ্রিন রুমে?

অথচ, পাশ্চাত্য চিত্রনাট্যের কিম্ভূত
ডালপালা বিস্তৃত হচ্ছে
দেশীয় পালাগানের মরমি আখ্যানে...

## অম্বরীশ ঘোষ

# হাততালি

নিকোনো পরিপাটি অন্ধকারজুড়ে খোদিত জীবন দর্শন
আলোর ছিদ্র বেয়ে ঢুকে যাচ্ছে বর্ণহীনতা
জন্মান্ধ এক ঈশ্বরের তালু আঁকড়ে আছে
আমাদের যাবতীয় দৌড়

ল্যাম্পপোস্টের কুয়াশা-আলো উটের মতো পিঠ উঁচিয়ে
নিচে ডিগবাজি খাচ্ছে মেকি সভ্যতার উপাখ্যান
ওপাশে অন্ধ গলির পাংশুটে পাশ বেয়ে
কারো আসার অপেক্ষা

বন্ধ্যা জরায়ুর সীমানা পেরিয়ে মেঘ সরে গেলে
সার্কাসের তাঁবুর ভেতর থেকে হাততালি বেজে উঠুক

## বিপুল অধিকারী

# চন্দ্রকথা

(আমার সকল ভারতীয় বন্ধু)

একটা চরকা
চালায় চাঁদের বুড়ি একা
একা চন্দ্রে–এই
ছবি মনের মইধ্যে গেঁথে
দিয়েছিলেন দিদিমা। আর
আমি সে ছবিটা বুকে আগলে পার করেছি গত
শতাব্দী। দিদিমা গত হয়েছেন; এই এক দুঃখ,
নইলে তিনি নতুন গল্প ফেঁদে শোনাতেন এই
জমানায়। কেন না, এখন আর চাঁদের কপালে কোন
জননী টিপ দেবার আবদার করেন না। কেন
করবেন? বলুন তো! হাসি পায়। হা হা!
আমার সে দিদিমার মতো
চাঁদের বুড়িও রাম নাম সত্য হায়;
এখন তার ভিটেয় ঘুঘু চড়ে, দেখি।

## সুদীপ চট্টোপাধ্যায়

# শামিয়ানা

চিন্তা জমাট বেঁধে কবে যেন আমাদের মন হলো–
বেদনাশ্রিত
চিন্তা জমাট বেঁধে এত বেশি মানবিক হলো
সেই থেকে আমাদের ঘরবাড়ি খুব নির্জীব

এসো এই হাতের রেখায়
পারাপার করে দেই আমাদের ভেঙে-যাওয়া দেশ
কথার ভেতরে পুষি খুব মেলামেশা

ভাষার উঠোনে আজ গোল হয়ে বসি
মন তুমি বেদনাশিবির–আমাদের তার কথা বলো

চিন্তা দীর্ঘ যতি–বহুদিন প্রবাসে রয়েছে

## স্নিগ্ধা বাউল

# পোয়াতি বৃষ্টি

অনেকদিন বৃষ্টি ছুঁয়ে দেখি না
হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া বৃষ্টি
না দেখলেও অনুভব করেছি
বৃষ্টি একটা আস্ত পুরুষ মানুষ;
হাত ছোঁয়ার বাসনায় গড়িয়ে যায়
ছুঁয়ে যায় আপাদমস্তক
প্রকাশ থেকে গোপন যত কথা
অঙ্গের কলকাঠি।

বৃষ্টির খবর নেই অনেকদিন;
হালের বলদগুলো বৃষ্টি চায়, অনেক নরম
মাটি খুঁড়ে আনবে
এক পোয়াতি গাছ;
আমি ভুলিনি আমার বৃষ্টির জলে
পোয়াতি হবার সম্ভাবনা।

## নিলয় রফিক

# আড়ালে নজর

অদৃশ্যে শিল্পের দেশে প্রত্যহ উড়াল
চোখের সেতুর পাড়ে বনফুলের দৃশ্য
সুরভি মুগ্ধতা প্রেমে শব্দের আলাপ
অচেনা নক্ষত্র খুঁজে বাল্টিক সাগরে।

অসময়ে শিলাবৃষ্টি দিগন্তে কূজন
পুরানা শার্ট হাজির, স্মৃতিময় ঘর
আনন্দ-বিচ্ছেদে ঘাটে মনের দেয়াল
রক্তবীজে মুদ্রাহাতে সুখের নির্বাণ।

ফাল্গুনে রোদ উড়ছে, প্রমত্ত জোয়ার
বিমূর্ত শরীরে ডানা স্বর্গের সোপান
পুলসিরাতের পথে ভয়ানক ঝড়
সামনে গেলেই মেঘ আড়ালে নজর।

অনূদিত কবিতা

# জয়ন্ত মহাপাত্রের পাঁচটি কবিতা

**অনুবাদ ও ভূমিকা : আলম খোরশেদ**

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জয়ন্ত মহাপাত্র (২২ অক্টোবর ১৯২৮-২৭ আগস্ট ২০২৩) আর কিছুদিন পরেই, অক্টোবরের ২২ তারিখে, পঁচানব্বই পূর্ণ করতেন। কিন্তু তার আগেই গত ২৭ আগস্ট তিনি এই মর্ত্যপৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। কবির প্রতি বিদায়ী শ্রদ্ধা জানিয়ে পাঁচটি নির্বাচিত কবিতার বঙ্গানুবাদ করা হলো

জয়ন্ত মহাপাত্র উড়িষ্যা প্রদেশের মানুষ হলেও সাহিত্যচর্চা করতেন প্রধানত ইংরেজি ভাষাতেই। অবশ্য মাতৃভাষা উড়িয়াতেও তাঁর বেশকিছু লেখালিখি ও গ্রন্থ রয়েছে। এবং তিনিই ভারতের প্রথম কবি যিনি ইংরেজি কবিতার জন্য সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার পান ১৯৮১ সালে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক জয়ন্ত মহাপাত্র সারাজীবন শিক্ষকতা করে ১৯৮৬ সালে কটকের বিখ্যাত রাভেনশ কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সাহিত্যে আগমন তাঁর খানিকটা বিলম্বেই, ষাট দশকের শেষপাদে। প্রথম প্রথম ভারতের সাহিত্য সাময়িকীগুলো থেকে তাঁর প্রায় লেখাই প্রত্যাখ্যাত হতো। এরপর আন্তর্জাতিক পরিসরে তাঁর লেখা নিয়মিত ছাপা হতে শুরু হলে যথারীতি ভারতেও তিনি সাদরে গৃহীত হন এবং লেখক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠার পথ খুলে যায়। জয়ন্ত মহাপাত্র ও তাঁর অপর দুই সতীর্থ এ. কে. রামানুজন (১৯২৯-১৯৯৩) ও আর. পার্থসারথী (জন্ম. ১৯৩৪) ভারতীয় আধুনিক ইংরেজি কবিতার মূল ভিত্তি রচনা করেন। তাঁদের কবিতা মুম্বাই ঘরানার ইংরেজিভাষী কবিদের কবিতার চেয়ে খানিকটা স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী ধারার।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে : Close the Sky Ten by Ten (1971), A Rain of Rites (1976), The False Start (1980), Relationship (1980) ইত্যাদি। এর বাইরে উড়িয়া ভাষাতে তাঁর গোটা সাতেক কবিতার বই রয়েছে। কবিতার পাশাপাশি গদ্য রচনাতেও সিদ্ধহস্ত তিনি। তাঁর গদ্যগ্রন্থের মধ্যে ছোটগল্পের বই The Green Gardener (1997) ও প্রবন্ধ সংকলন Door of Paper : Essay and Memoirs (2006) উল্লেখযোগ্য। মৌলিক লেখার সমান্তরালে তিনি উড়িয়া কবিতার ইংরেজি অনুবাদেও যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অনূদিত কবিতাগ্রন্থ : Wings of the Past (1976), Verticals of Life (1996), A Time of Rising (২০০৩) ইত্যাদি।

২০০৬ সালে তিনি উড়িষ্যার উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ২০০৯ সালে তাঁর নিজের কর্মস্থল রাভেনশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডিলিট উপাধি পান। একই বছর তিনি তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকীর্তির জন্য ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী উপাধিতেও ভূষিত হন। এর বাইরে, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা লাভের পাশাপাশি তিনি শিকাগোর বিখ্যাত পোয়েট্রি ম্যাগাজিন ও জয়পুর সাহিত্য সম্মেলন পুরস্কারও পেয়েছেন।

## পর্যটক

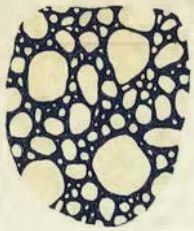

প্রত্যেক সন্ধ্যায়
নিকট-মন্দিরের ঘণ্টাগুলো
হাড়ের ওপর রাখে তাদের হালকা ওজন;
আবারও ভাবার সময় এসেছে
আমি যা শিখেছি তা দিয়ে আমার কী করা উচিত।

আঁধার হয়ে আসা পৃথিবীর বুক থেকে
উষ্ণ বাষ্পের মতো ওঠে আশার ইশারা।
কোথাও, কোনো ঘরের ভেতরে
মায়ের হাতের মধ্যে মারা যাচ্ছে তার মেয়ে।
অন্যত্র কেউ নিজেরই বিরুদ্ধে
প্রতিশোধ নিচ্ছে তার জীর্ণ জীবনের জন্য।
আমি মানুষের দিকে দেখি। দেখি আমার নিজের বেদনার দিকে।
দূরে, কোনো জুঁইফুলের বিষণ্ন মধুর হাসির দিকে।
এখানে চলাচলের একটা উদ্দেশ্য রয়েছে :
তা শীতল ও শ্রান্ত নয়।
হরিণেরা তাড়া করছে নতুন গজানো ঘাসেদের।
আকাশের বিপরীতে বাজছে দুন্দুভি।
এক নারী তার হাঁটু গুটিয়ে আনে বুকের কাছে।
এবং যে বাতাস তার নিজের সঙ্গে প্রতারণা করেছে
সে ঐ মায়ের আলিঙ্গনের মধ্যে মরণোন্মুখ
মেয়েটির আর্তনাদকে খুব স্পষ্টভাবে বয়ে নিয়ে আসে।
আমার প্রজ্ঞা ও আমার সময়
পাখিদের ডানা ঝাপটানোর মতো
রাত্রির কাছে শান্ত হতে ব্যর্থ হয়।
আমি এই বোঝাকে হালকাভাবে নিতে চাই।
কিন্তু অজানার ওজন আমাকে একেবারে সমাহিত করে দেয়।

## তার হাত

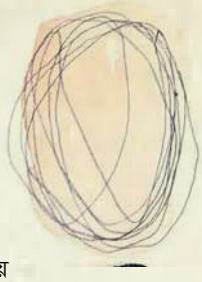

ছোট্ট মেয়েটির হাত অন্ধকার দিয়ে বানানো
আমি তাকে কী করে ছুঁই?

রাস্তার বাতিগুলো কর্তিত মাথার মতো ঝুলে থাকে
রক্তের ধারা আমাদের মাঝখানের ভয়ংকর দরজা খুলে দেয়

স্বদেশের হাঁ-করা খোলামুখ ব্যথায় বন্ধ হয়ে আসে
পেরেকের বিছানায় তার সারা শরীর কুঁকড়ে থাকে

এই ছোট্ট মেয়েটির ধর্ষিত শরীরখানাই শুধু আছে
আমি যার কাছে পৌঁছাতে পারি

আমার অপরাধবোধের বোঝা
তাকে আলিঙ্গনের বাধা অতিক্রম করতে অক্ষম

## হারানো মানুষ

অন্ধকার ঘরে
এক নারী
আয়নায় তার ছায়া দেখতে পায় না

ঘুমের প্রান্তে
যথারীতি অপেক্ষমাণ

তার হাতে ধরা
হারিকেন
যার হলুদ মাতাল শিখারা জানে
কোথায় লুকনো তার নিঃসঙ্গ শরীর

## গোধূলি

দিনের আলোর শেষ ইচ্ছার মতন
একটি কমলারঙের আভা
হাসপাতালের ফ্যাকাসে শার্শিগুলোকে উজ্জ্বল করে তোলে।
এখনো অন্ধকার নামেনি।

বাচ্চাদের ওয়ার্ডে
জনৈক মায়ের মুখের নিচেই মৃতশিশু,
খুব কমবয়সি, বরাবরই।
নদীর কণ্ঠনালিতে চমকায় জল।

তার চিৎকার :
অভিশাপের মধ্য দিয়ে একটি আকুতিকে ছড়িয়ে দেওয়া?

এমনই গোধূলি নামবে অন্যকোথাও
স্ফুটনোন্মুখ জুঁইফুলের শাদা রং ঢেকে দিতে।

রাস্তার ওপারের বাড়িতে
সদ্য জ্বালানো বাতি
আমাকে আগস্টের ভেজা সন্ধ্যার দিকে তাকাতে প্ররোচিত করে
যে তার ছোট্ট নরম দুহাতে ধরে রাখে
জগতের বিশাল অজানাকে।

## গ্রীষ্ম

এখনো নয়।
আমগাছের নিচে
পরিত্যক্ত আগুনের ছাই।

ভবিষ্যতের কী প্রয়োজন?

একটি দশ বছরের মেয়ে
মায়ের চুল আঁচড়ায়,
যেখানে ঝগড়ুটে কাকেদের
নীরব বসবাস।

বাড়ি তার কোনোদিনই
হবে না।

তার মনের কোণে
একটি জ্যান্ত কাঁচা আম
ঝরে পড়ে ধীরে পৃথিবীর মাটিতে।

## ওয়ালীউল্লাহ্‌র শতবর্ষে ফিরে পড়া

# ‘লালসালু’

গৌতম রায়

জন্মশতবর্ষ

ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই উপন্যাসটিতে সেই সম্ভাবনার চিত্রটি নানা ধরনের কৌশলকে অতিক্রম করে সর্বোপরি জীবনের জয়গান গাইবার ভোরের প্রত্যাশাকে উদ্ভাসিত করবার একটা যেন সুবিস্তীর্ণ কবিতা হিসেবে নিজেকে মেলে ধরছে। ক্ষুধা যে যুগ যুগ ধরে সময়ের সমস্ত আকীর্ণ বেড়াজালের ভিতর নিজেকে জাগিয়ে রাখে সৃষ্টির প্রলয়কে ত্বরান্বিত করবার তাগিদে, তাই নিশুতি রাতের নয়া দেশ, এক শস্যহীন বিরান মাঠকে উপস্থাপিত করে, উপন্যাসের চরিত্রগুলোর গভীরে প্রবেশের একদম সূচনাপর্বে এক অদ্ভুত শিহরন জাগায় পাঠকচিত্তে। নদীগর্ভে জমি বিলীন হয়ে যাওয়ার ভাবনাও আবহমান কালের মানবসমাজের সঙ্গে, নদী জীবনের সম্পর্কটিকে যেন এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের মতোই জড়িয়ে থাকার বিষয়টিকে জানান দেয় লেখকের জবানিতে । তাই লেখকের ভাষায় মনে হয়, ‘কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ’

মৃত্যুকে আবাহন করে কি জীবনের ছন্দ এখানে খুঁজতে চাইছেন লেখক? মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনকে দেখা, এমন এক অনালোচিত জগতের উদ্ভাসনের যে আভাস, এই মরার দেশের অন্বেষণের ভেতর দিয়ে লেখক শুরুতেই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন, সেখান থেকেই যেন আমরা বুঝতে পারি, কোথায় ব্যতিক্রমী ধারায়, হতাশা থেকে আশার আলোর দিকে মানবজীবনের বারোমাস্যাকেই শুধু নয়, গোটা দুনিয়ার মন্দকে ভালোর পথে পদচারণার আভাস লেখক ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন। নিরাশা থেকে আশার পথে যাত্রা–এটাকে কি আমরা ওয়ালীউল্লাহ্‌র কালজয়ী সৃষ্টি 'লালসালু'-এর প্রধান প্রতিপাদ্য বলব? আসলে উপন্যাসটির প্রতিটি স্তবকেই যে চমক আছে, তাতে এক একটি স্তবক পড়লে পাঠকের এটা মনে হতে পারে, এটাই বোধহয় গোটা উপন্যাসটির মূলবার্তা। আবার পরের স্তবকে যখন পাঠক যাচ্ছেন, তখন সেই স্তবকের মর্মবাণীকে, আগের স্তবকের ভাবনার থেকেও আরও কয়েক কদম এগিয়ে থাকা ভাবনা হিসেবে পাঠকের মনে হবে।

এই যে নিজের চিন্তাকেই নিজে অতিক্রম করে, আরো একটা নতুন চিন্তার পথে পাঠককে পৌঁছে দেওয়া–এখানেই বোঝাচ্ছে লেখক হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রধান সার্থকতা। কালোজয়ী সাহিত্য নির্মাণ করতে গেলে এক অদ্ভুত শব্দচয়নের দিকে নজর দিতে হবে, লেখার রীতিকে প্রচলিত ধারার বাইরে নিয়ে এসে, তাকে অনন্য সাধারণ হিসেবে উপস্থাপিত করবার 'তাগিদ' থেকে, সাহিত্যের সমস্তরকম ব্যাকরণগত জায়গা থেকে সরে আসতে হবে–এমন ধারায় ওয়ালীউল্লাহ্ এই উপন্যাসটি লেখেননি।

তাঁর কলমে অমন রসহীন রসের ভিয়ানের যোগান নেই। তাই লালসালুর মতো ধ্রুপদী উপন্যাসটি কিন্তু কেবলমাত্র ধ্রুপদী মেধাসম্পন্ন পাঠকের কাছেই উপজীব্য হবে, আর অতি সাধারণ পাঠক, যাঁদের প্রথাগত শিক্ষা, মানসিক শিক্ষা এগুলো খুব উন্নত হওয়ার সুযোগ ঘটেনি, তেমন পাঠকের কাছে উপযোগী হবে না, গ্রহণযোগ্য হবে না–এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্ তা আর কলমকে প্রসারিত করেননি। কলমের এই মুন্সিয়ানার জায়গা থেকেই বিশেষভাবে বলতে হয়, ধ্রুপদী সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই যে মানুষের মুখের ভাষাভঙ্গিকে উপন্যাসে নিয়ে আসা, এমন ক্ষমতা কিন্তু বহু স্রষ্টারই থাকে না। এখান থেকেই লালসালুর ব্যতিক্রমী জায়গাটা অনেক বেশি করে আমাদের মননলোককে সতেজ করে তোলে।

না খেতে পাওয়া, সেই না খাওয়া থেকেই জেগে ওঠা একটা অন্যরকম ভাব, সেই ভাবের যে মানুষদের কথা ওয়ালীউল্লাহ্‌র কলমে উঠে আসে, সেখান থেকেই ক্ষিপ্রগতিতে আগুয়ান হয় এক অচেনা দুনিয়ার কথা। শহুরের মধ্যবিত্তের কাছে ধর্মকে ব্যবহার করে, অধর্মের পথে মানুষকে নিয়ে যাওয়ার সেই চিরন্তন খেলাটা, অনেকটাই অজানা অচেনা। সেই অজানা অচেনা পথে, শিক্ষিত মানসলোকে যেন বেড়াতে নিয়ে এসেছেন লেখক। নিয়ে এসেছেন এমন এক দুনিয়াদারির মাঝে, যেখানকার কথা সাধারণভাবে চাকচিক্যের দুনিয়ায় বসবাসকারী মানুষের জানবার কথা না। জানবার সুযোগও সেখানে মানুষের থাকে না। কয়েকগাছি ফিকে দাড়ির অসংযত দৌর্বল্যে মাহাত্ম্য ফোটানোর যে চেষ্টার কথা ওয়ালীউল্লাহ্ বলেছেন, সেই চেষ্টার দুনিয়া থেকে একটা বড় অংশের মানুষ আজও নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারেননি।

যে আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়তে যাওয়ার কথাও লেখক লিখেছেন, সেই আশার কুহকিনী থেকে আজও দুনিয়ার একটা বড় অংশের মানুষ নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারেনি। নিতে না পারার পেছনে তাদের জীবনকে প্রতিবন্ধকতা অতল গর্ভে নিমজ্জিত করবার জন্য যে রাজনীতির খেলা সেই খেলার একেবারে একেবারে ভূমিস্তরের চিত্রটি এই মজিদ নামক চরিত্রটির ভেতর দিয়ে এখানে ফুটে উঠেছে। তা যেন একটা সম্প্রদায়কে রাজনীতির বড়ির চাল হিসেবে ব্যবহার করবার চিরকালীন প্রচেষ্টার এক হাহাকারময় প্রতিচ্ছবি। কেতাবে লেখা বিদ্যার যুগ যুগ ধরে চড়াই আটকে রয়েছে একথা বুঝেই সেই চড়ায় কিভাবে নোঙ্গর করে নৌকো নোঙ্গর করবার পর কিছুটা সময় চলার আঁধারে বাধানে ঘুরে বেড়িয়ে আবার স্রোতের দিয়ায় নিজেকে ভাসিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় সে এক অন্তহীন দুনিয়ায় সাঁতার কাটতে চায় এই সবই যেন উপন্যাসের পলকে পলকে আমরা ফুটে উঠতে দেখি। আক্ষেপ করে ওয়ালীউল্লাহ বলেছিলেন; চড়া কেটে সে বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে

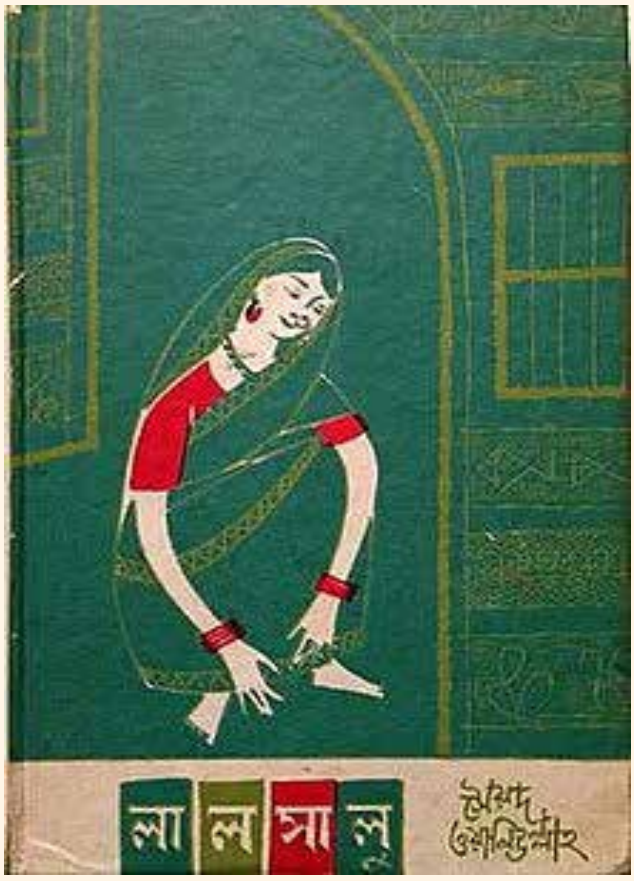

১৯৪৮-এ প্রকাশিত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকৃত প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই।

লোক না থাকার যে হাহাকারের কথা ওয়ালীউল্লাহের হৃদয়ের ক্ষরণ হিসেবে আমরা উঠে আসতে দেখেছি। সেই ক্ষরণের ট্র্যাডিশন যেন আজও সমানে চলিতেছে। আজও চড়া কেটে আটকে পড়া বিদ্যার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ নৌকাকে স্রোতের টানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত মানুষ দুর্লভ। শুধু দুর্লভ বললেও বোধহয় সবটা বোঝানো হয় না। দুর্লভ থেকে দুর্লভতর, দুর্লভতম জায়গায় এসে সেই মানুষের অভিব্যক্তিটি আটকে পড়েছে। অতীত কালের অরণ্যে আর্তনাদের যে বুকফাটা কান্নার কথা ওয়ালীউল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন, সে কান্না বোধহয় আজও সৃষ্টির জঠর থেকে প্রায় প্রতিদিনই নতুন করে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, এবং সৃষ্টির সেই গর্ভ যন্ত্রণা যেন আমাদের চেতনালোককে বারবার প্রবিষ্ট করাচ্ছে এক ভয়ঙ্কর রকমের হাহাকারের দুনিয়ায়। যে দুনিয়া থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাই। যে হাহাকার কে আমরা অতিক্রম করতে চাই। কিন্তু চাইলেই তো সেটা মেলে না। তবে চাওয়ার তাগিদটা যদি থেমে যায়, চাওয়ার তাগিদটা যদি ঢিমে হয়ে যায়, তবে এক বদ্ধ জলাশয়ের ভেতরে সময় সমাজ, সংস্কৃতি, সর্বোপরি মানুষ ডোবাবে নিজের প্রাণটাকে। এই খেলার দুনিয়াদারি থেকে আলগা করে নেবে নিজেকে।

অমনভাবে তো আর সাধের মানব জনমকে অবেলায় বইয়ে দেওয়া যায় না। আঘাটায় ভিড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই আঘাটা থেকে ঘাটের দিকে যাত্রা করবার প্রচেষ্টা, তারই নাম হলো জীবন। আর সেই জীবনের গাওয়াই হলো ধর্মের শাসনের নামে, শোষণের দুনিয়ার যে গোড়াপত্তন এবং প্রবাহমানতা মজিদরা বইয়ে রাখতে চায়, তাকে শাসনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে এনে, দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে, দুনিয়ার খোলা হওয়ার সামনে এনে উপস্থাপিত করা।

প্রাচীনকালের প্রথাগত শিক্ষার সীমাবদ্ধতার কথা যেভাবে স্রোতের অপারগতার রূপকের ভেতর দিয়ে লেখক এখানে ব্যবহার করছেন, তা যেন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, প্রাচীনযুগের প্রথাগত শিক্ষার সীমাবদ্ধতার সেই ট্রাডিশনকে আমরা আজও কীভাবে বহন করে

নিয়ে চলেছি আর সেই বহনের মধ্যে আমরা কিরকম অদ্ভুত পৈশাচিক উল্লাস বোধ করছি, যে উল্লাসের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। সামাজিক ভিত্তি নেই। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তো নেইই।

'লালসালু' উপন্যাসের সূচনাপর্বে নিম্নবিত্ত মানুষদের পেটের টানে পরিযায়ী হওয়ার এক হৃদয়স্পর্শী ছবি রয়েছে। এই ছবি আঁকতে গিয়ে লেখক বলছেন; 'এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার মেশিনম্যান টেনারিতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলির মসজিদ–এমনকি গ্রামে-গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ কেউ দূরদুরান্তে চলে যায়। হয়-তো বাহে মুলুকে, নয় তো মনিবের দেশে। দূর দূর গ্রামে–যে গ্রামে পৌঁছতে হলে কত চড়া পড়া পেরোতে হয়, মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ি দুর্গম অঞ্চলেকে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল–সেখানেও।'

পেটের তাগিদে পরিযায়ী বৃত্তির এই যে মর্মস্পর্শী চিত্র চারের দশকের গ্রামবাংলাকে কেন্দ্র করে ওয়ালীউল্লাহ্ চিত্রিত করছেন, এ ছবির কি আজও কোনো অদল-বদল ঘটেছে? আজও বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ, নিজের এলাকায় কোনোরকম কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে, নিজের গাঁ-ঘর ছেড়ে, পরিবার-পরিজন ছেড়ে, ভিনদেশে, পেটের তাগিদে বসত করতে বাধ্য হয়।

এই যে পেটের তাগিদে মানুষের বাস্তুচ্যুত হয়ে পরিযায়ীবৃত্তিতে জীবনকে সঁপে দেওয়া, এর ভেতর দিয়ে সামাজিক বিন্যাসের এক যন্ত্রণাদায়ক চিত্র ফুটে ওঠে। আবার সেই যন্ত্রণার পাশাপাশি বহতা নদীর মতো মানুষের পেটের তাগিদে পরিযায়ী হওয়ার মধ্যে দিয়ে, মানুষের সংস্কৃতির ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রেও যে একটা নতুন আঙিনার উন্মোচন ঘটে, তাকেও আমাদের উল্লেখ করতে হয় এবং মর্যাদার সঙ্গে স্বীকারও করতে হয়। অর্থনৈতিক সংকট থেকে পরিযায়ী হওয়ার মধ্যে এক ধরনের যন্ত্রণা কাজ করে ঠিকই, কিন্তু সেই যন্ত্রণার ভিতর দিয়েও সংস্কৃতির একটা বিস্তার লাভ ঘটে। সেই বিস্তার কখনো লোকায়ত দুনিয়াকে উন্মোচিত করে। আবার কখনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বেড়াজালকে আরো বেশি ঘোরালো করে, এক ধরনের সামাজিক সংকটের নতুন আবর্তের জন্ম দেয়।

আলোচ্য উপন্যাসে এই পরিযায়ীবৃত্তির ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বহমানতার পরিবর্তে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে আশ্রয় করে, ধর্মের নামে সামাজিক শোষণের এক ভয়াবহচিত্র কেই-বা আমরা একেবারে জীবন্ত দগদগে ঘায়ের মতো সমাজের বুকে ফুটে উঠতে দেখি। এই যে ধর্মকে ব্যবহার করে সামাজিক শোষণ, অর্থনৈতিক শোষণ–এটাই পরবর্তী সময় দেখা যায় আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের পর্যবসিত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দিকে পরিচালিত হয়। গোটা পর্যায়ক্রমটি তিন চারের দশকের যে প্রেক্ষিত এই উপন্যাসে এসেছে, সেই প্রেক্ষিতের ভেতর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মানসিকতা, ধর্মকে কেন্দ্র করে তখনও বাংলার বুকে সেইভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি ঠিকই। কিন্তু 'মজিদ' নামক চরিত্রটির একটি মাজারকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক নির্যাতন দুর্বলের ওপরে, সর্বোপরি বিকৃত যৌনলালসা, এসব কিছুই যেন আগামীদিনের ভারতীয় উপমহাদেশে যেভাবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের ভেতর দিয়ে ধর্মান্ধ মৌলবাদ, পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, সমন্বয় চেতনার বিরুদ্ধে এককেন্দ্রিক মৌলবাদী ভাবনাচিন্তার প্রসার– এইসব কিছু অশুভ ঘটনাক্রমের একটা ইঙ্গিত আমাদের সামনে খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরছে।

পেটের তাগিদে একেবারে মাটির শিকড়ের সঙ্গে মিশে থাকা মানুষদের এই পরিযায়ী অবস্থায় সার্বিক বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহ্ নিয়ে আসছেন মুসলমান জনসমাজের সামাজিক অবস্থানের দিকটিকে। তিনি লিখছেন; এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয় তো একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশি পোশাক, মুখমণ্ডল মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।'

ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই মূল্যায়নের ভেতর দিয়ে বিশশতকে নবোত্থিত মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের একটা ছবি আমরা পাচ্ছি। তার পাশাপাশি সমাজের ভূমিস্তরে অবস্থান করা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ, যাঁরা একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে আছেন মেধার দিক থেকে তাদের অবস্থান যে কি, সে বিষয়টির মূল্যায়ন করবার মতো কোনো মাপকাঠি তখনও নির্মিত হয়নি, এখনো নির্মিত হয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রবল সংশয় অবশ্যই প্রকাশ করতে পারা যায়–এই যে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে থাকা সমাজের অংশটি, তাঁদের প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ, সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক নানা পরিমণ্ডলের ফলে না পেয়ে উঠলেও, কায়িকশ্রমের দ্বারা তাঁরা সামাজিক পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে এমনভাবে নিজেদেরকে মিশিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে, যার দ্বারা অত্যন্ত কষ্টে-শিষ্টে তাদের পেটের ভাত যোগাড় হচ্ছে। যদিও তাঁদের যে কায়িক শ্রমজনিত ফল, তা সমাজের বুকে কিন্তু সার্বিক পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আনছে। বিশেষকরে এই যে শিক্ষিত মুসলমান সমাজ, ধীরে ধীরে সমাজের বুকে নিজের পদচিহ্ন রাখতে শুরু করছে, সেই অংশের মানুষেরা, নিজেদেরই এই পিছিয়ে পড়া অংশের ভেতর দিয়েই নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের একটা পরিমণ্ডল তৈরি করছে।

সমাজ বিকাশের সাধারণ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সভ্যতার পিলসুজস্বরূপ এই ভূমিস্তরে অবস্থান করা মুসলমানেরা, তাঁদের গা দিয়ে কিন্তু তেল গড়িয়েই পড়ছে, গড়িয়েই পড়ছে। আর আলো পাচ্ছে উপরের অংশের মানুষ। অর্থাৎ যাদেরকে লেখক এখানে 'নতুন খোলস পড়া শিক্ষিত মুসলমান'–এই অভিধায় বর্ণিত করেছেন।

সমাজ বিকাশের সাধারণ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সভ্যতার পিলসুজস্বরূপ এই ভূমিস্তরে অবস্থান করা মুসলমানেরা, তাঁদের গা দিয়ে কিন্তু তেল গড়িয়েই পড়ছে, গড়িয়েই পড়ছে। আর আলো পাচ্ছে উপরের অংশের মানুষ। অর্থাৎ যাদেরকে লেখক এখানে 'নতুন খোলস পড়া শিক্ষিত মুসলমান'–এই অভিধায় বর্ণিত করেছেন

আধুনিক বিজ্ঞানমুখী শিক্ষাকে গ্রহণ করে যে মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব ঘটছে বাঙালি মুসলমান সমাজের ভেতরে, সেই নবোত্থিত মধ্যবিত্ত সমাজ, তাদের নিজেদের সমাজেরই পিছিয়ে পড়া অংশের প্রতি ততোটা যত্নবান হবে না, এই আভাস কি ওয়ালীউল্লাহ অনেক আগেই অনুভব করতে পেরেছিলেন? তাই কি তিনি 'নতুন খোলস পড়া নব্যশিক্ষিত মুসলমান'–এই শব্দটাকে এমন একটা ব্যাঙ্গাত্মক অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে উপন্যাসের ভেতরে প্রায় সূচনাপর্বেই এভাবে প্রকাশ করলেন?

দ্বন্দ্বটা কোন জায়গা থেকে উঠে আসে, সেটা সুদূরপ্রসারী চিন্তার মানুষরা দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ন্যূনতম দেখা দিলেই অনুভব করতে পারেন। ওয়ালীউল্লাহ্ ঠিক একইভাবে এই দ্বন্দ্বের সম্ভাবনার আভাস পেয়ে একটা ব্যাঙ্গের মোড়কে আধুনিক শিক্ষার পরিমণ্ডলে আসা মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশকে ঘিরে নিজের এই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছিলেন।

নাকি ব্যাপারটা সাধারণীকরণ করে ফেলছি আমরা? যেটা করা আদৌ উচিত না? সামগ্রিকভাবে আধুনিক শিক্ষার পরিমণ্ডলে আসা গোটা মুসলমান সমাজকে এই দ্বন্দ্বের শরিক করা কি ঠিক? সেটা ওয়ালীউল্লাহ্‌ও করেননি। কিন্তু আধুনিক ভাবধারার আওতার ভেতরে আসা একটা মানুষও যদি তার নিজের পরিমণ্ডলের যে মানুষটি আধুনিক শিক্ষায় এবং আর্থিক স্বাবলম্বনের অভাবে সমাজের মূল স্রোতের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, সেই মানুষটির প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক নেতিবাচক একটা মানসিকতা নিয়ে চলেন, তবে গোটা সমাজব্যবস্থার আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দিকটি কীভাবে একটা নতুন ধরনের সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। সেই আশঙ্কা

এবং আশঙ্কার পরিণতির কথা উপন্যাসটিতেই ছড়িয়ে দিয়েছেন লেখক।

যে সংকটের আবর্তের নিত্যনতুন কলাকৌশলের গভীরে লেখক প্রবেশ করতে চলেছেন 'লালসালু' উপন্যাসের ভেতর দিয়ে, সেই সংকটের ঘনায়মান পরিবেশ পরিস্থিতির উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধানের একটা ঝলকের ভেতর দিয়ে, সমস্যার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করা, সাহিত্য সৃষ্টির দিক থেকে যেমন একটা অনবদ্য মুন্সিয়ানার পরিচয়, তেমনিই সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকেও একটা নতুন দিকনির্দেশ এখানে লেখক করছেন।

একজন লেখকের কাজ কেবল সংকটের স্বরূপ অনুসন্ধানে কাহিনির ঘনায়মান বর্ণনার ভেতর দিয়ে সবকিছুকে বিবৃত করা নয়। সংকটের ঘনো মেঘ কেন সামাজিক আবর্তের আকাশে জমা হতে শুরু করেছে, তার কারণ অনুসন্ধানই একজন লেখকের অন্যতম প্রধান কাজ। কারণ, লেখক হিসেবে যাঁরা কালজয়ী হন, তাঁরা কেবলমাত্র নিছক লেখক থাকেন না। লেখকসত্তার পাশাপাশি নিজেদের সমাজবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকসত্তাটিকেও সমানভাবে জাগরুক রেখে, তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিকর্মকে প্রসারিত করে, সেই প্রসারণের মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তোলেন, একজন পরিপূর্ণ মানুষের সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধের বিষয়টি।

তাই এই উপন্যাসের সূচনাপর্বে যে দ্বন্দ্বের আভাস দিয়ে কাহিনির ঘনায়মান আবর্তের ভেতরে ওয়ালীউল্লাহ্ প্রবেশ করছেন, সেই বোধটা সৃষ্টির দুনিয়ায় এক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা দান করছে। আর সেখান থেকেই উপন্যাসের ঘনায়মান ঘটনার দুর্গম অঞ্চলে, মিহিকণ্ঠের আজান শুনে নতুন খোলস পড়া, নব্যশিক্ষিত মুসলমানটির চমকে ওঠা, এক অদ্ভুত চিত্রকল্প হিসেবে উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে। লেখক যে দুর্গম অঞ্চলের বর্ণনা করছেন, সেই দুর্গমতা কেবল যে ভৌগোলিক দুর্বলতার অর্থে তিনি ব্যবহার করছেন, এমনটা মনে করলে লেখকের দার্শনিকসত্তার প্রতি অবিচার করা হবে। সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষিতের 'দুর্গমতা' এখানে ভৌগোলিক দুর্গমতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আর সেই দুর্গমতার মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা, এক অদ্ভুত মায়াবী পরিমণ্ডলের দিকে পাঠকের চিত্তকে স্থাপিত করছে।

একজন বিশ্বাসী পাঠক এই মিহিকণ্ঠের আজানধ্বনির ব্যঞ্জনায় একভাবে তার পাঠকসত্তাকে পরিচালিত করবেন। আবার যিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করেন না, তেমন মানুষ তার নিজের চেতনা অনুযায়ী, এই মিহিকণ্ঠের আজানের ব্যাখ্যা, নিজের কাছে এমনই সব ধরনের মানুষের চিন্তার চিত্রকল্পের দোদুল্যমানতার মধ্যেই মৌলবী মজিদ চরিত্রটিকে প্রথমেই উপন্যাসের পাতায়াঁই করিয়ে নেবে যে, এরপর থেকে গোটা উপন্যাসে দ্বন্দ্ব-বিরোধের দোলাচলে এই মৌলভী হয়ে উঠবে একঅর্থে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। যে চরিত্রের চারিত্রিক বিস্তারের নানা ওঠানামা পাঠকতৃপ্তকে কখনো শঙ্কিত করবে কখনো সন্ত্রস্ত করবে কখনো আবেগমোথিতও করবে। আবার কখনো বিরক্ত হয়ে উঠবেন পাঠকধর্মকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহারে, যৌন লালসা চরিতার্থ করবার তাগিদে পরিচালিত করবার বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে।

এ হেন চরিত্রই যে পরবর্তীকালে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের পরিমণ্ডলকে, বাংলার আকাশ বাতাসকে এতটাই বিদীর্ণ করে ফেলে, যার জেরে আমাদের দেশমাতৃকা দ্বিখণ্ডিত হয়। আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে নিজেদের মধ্যে অপরিচয়, অবিশ্বাসের পাঁচিলটাকে কেমন যেন একটা এবড়োখেবড়ো অথচ অপটু বনিয়াদের উপরে স্থাপিত করবার দিকেই বেশি নজর পরিচালিত করতে থাকি। করতে থাকার ভেতর দিয়ে আমরা হারিয়ে ফেলি নিজেদের বিবেক। হারিয়ে ফেলি আমাদের মনুষ্যত্বকে। তবু ভাবি না পাঁচিলটা পেরিয়ে যদি একবার যেতে পারি, উপড়ে যদি ফেলতে পারি পাঁচিলের প্রতিবন্ধকতাকে, তবে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে এক অপার আনন্দ।

যে নতুন খোলস পরা নব্যশিক্ষিত মুসলমানের কথা লেখক বলছেন, এমন লোকের সঙ্গে প্রথম আলাপেই মিহিকণ্ঠের আজান প্রদানকারী মানুষটির অভিব্যক্তি হলো–'এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতালার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত, কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।'

পেটের তাগিদে ধর্মের রাজনৈতিক কারবারিরা কীভাবে ধর্মের বিকৃত উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে, প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদেরও বিপথে পরিচালিত করবার জন্য সব রকমের কৌশল অবলম্বন করে, মজিদকে ঘিরে এই অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলছেন, সৃষ্টিকর্তার আলোর অভাবের দোহাই দিয়ে যুগ যুগ ধরে, ধর্মকে ঘিরে অধর্মের কারবারিরা, সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে। সৃষ্টিকর্তার আলোর বিকাশ ঘটানো এই ধর্মের কারবারিদের আসল উদ্দেশ্য কখনো হয় না। যারা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তার আলোকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান, তারা কখনো কোনো ব্যক্তি উদ্দেশের তাগিদে নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে পরিচালিত করেন না। কোনোরকম অর্থকড়ি সংক্রান্ত চিন্তার ভেতর দিয়ে তাঁরা তাঁদের চেতনাকে প্রসারিত করেন না।

সুফিসন্ত-ফকির-মিশকিন থেকে সাধু-সন্ন্যাসী, যাঁরা প্রকৃতঅর্থে সৃষ্টিকর্তার পথে আত্মসমর্পিত, তাঁরা কখনো সঞ্চয়ের কথা ভাবেন না। যৌনলালসা তো দূরের কথা।

এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলনের সবথেকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি ঘটনা আমরা অনুধ্যান

শ্রীরামকৃষ্ণ খুব পেটের অসুখে ভুগতেন তাঁর মধ্যজীবনে। প্রথম জীবনে সাধনাজনিত নানা কারণে এত উপবাস, কঠোরতা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল যে পেটের রোগ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায় নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে ঘটনাক্রমের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিতির ব্যাপ্তি দক্ষিণেশ্বরের গণ্ডি অতিক্রম করে গোটা কলকাতা শহরময় সেভাবে ছড়িয়ে পড়েনি

করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ খুব পেটের অসুখে ভুগতেন তাঁর মধ্যজীবনে। প্রথম জীবনে সাধনাজনিত নানা কারণে এত উপবাস, কঠোরতা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল যে পেটের রোগ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায় নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে ঘটনাক্রমের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিতির ব্যাপ্তি দক্ষিণেশ্বরের গণ্ডি অতিক্রম করে গোটা কলকাতা শহরময় সেভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। পেটের রোগে কষ্ট পাওয়া শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমনির মন্দিরসংলগ্ন যদু মল্লিকের বাড়িতে গেছেন। সেখানে তাঁর অসুস্থতা ঘিরে আলাপ-আলোচনা হয়েছে যদু মল্লিক তাঁকে পরিমাণমতো আফিং সেবনের পরামর্শ দিয়েছেন। সেকালে ধারণা ছিল অত্যন্ত পরিমিত পরিমাণ আফিম নিয়মিত সেবন করলে জটিল পেটের রোগের আরাম হয়।

যদু মল্লিক একটি কাগজে করে কিছুটা আফিম শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়ে দিয়েছেন যাতে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে নিয়মিত এটি সেবন করে রোগ থেকে কিছুটা আরাম পান। সেই আফিমসমেত কাগজটি নিজের কাপড়ের খুঁটে বেঁধে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মন্দিরে তাঁর ঘরে ফিরে আসবার জন্য রওনা হয়েছেন, তখন তিনি কিছুতেই আর নির্দিষ্টভাবে নিজের ঘরে ফিরতে পারছেন না। ক্রমশ পথ গুলিয়ে ফেলছেন। বহু চেষ্টা করেও নিজের শয়নকক্ষে পৌঁছতে পারছেন না।

এই অবস্থায় তাঁর হঠাৎ মনে হয়, যদু মল্লিকের দেওয়া আফিম মোড়ানো কাগজটি তাঁর কাপড়ের খুঁটে রয়েছে। আত্মগ্লানিতে ভরে যায় শ্রীরামকৃষ্ণের মন। তাঁর তখন মনে হয়, সন্ন্যাসী কখনো কোনোরকম সঞ্চয় করতে পারে না। সন্ন্যাসীর পক্ষে সঞ্চয় অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তিনি তো যদু মল্লিকের দেওয়া আফিম মোড়ানো কাগজটি নিয়ে নিজের ঘরে ফিরতে চাইছিলেন। অর্থাৎ; এটিও তো এক প্রকারের সঞ্চয়। এমন তো সন্ন্যাসীর

> এটা মনে হওয়ামাত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের কাপড়ের খুঁট থেকে সেই আফিম জড়ানো কাগজটি ছুড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। তৎক্ষণাৎ যে পথ নিজের ঘরে ফিরবার জন্য তিনি বারবার গুলিয়ে ফেলছিলেন, অন্য পথে চলে যাচ্ছিলেন,

চরিত্রের সঙ্গে কখনো যায় না।

এটা মনে হওয়ামাত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের কাপড়ের খুঁট থেকে সেই আফিম জড়ানো কাগজটি ছুড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। তৎক্ষণাৎ যে পথ নিজের ঘরে ফিরবার জন্য তিনি বারবার গুলিয়ে ফেলছিলেন, অন্য পথে চলে যাচ্ছিলেন, সেই সমস্ত ভুলগুলোর অবসান ঘটিয়ে, তিনি স্বভাব সিদ্ধভাবেই নিজের শয়নকক্ষে ফিরে এলেন।

ধর্মনির্বিশেষে যেকোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তির এই বিনা সঞ্চয়ী মানসিকতা, সেটি তাঁর প্রকৃত সাধু হওয়ার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণের জায়গা থেকে যে বিচ্যুত হয়, সে পুজোপাট, নামাজ-রোজা যতই করুক না কেন, যতই নিজেকে নানা ধরনের আনুষ্ঠানিক ভাবভঙ্গির ভেতর দিয়ে খুব বড় সন্ত হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করুক না কেন, প্রকৃতঅর্থে যে, সে কখনোই সাধু বা ফকির বা যাজকের কোনো স্তরেই নিজেকে উপনীত করতে পারেনি, সেকথা আর আলাদাভাবে বলবার দরকার থাকে না।

ধর্মের কারবারি হলেও সে যে মানুষ, তার মধ্যে যেমন রক্ত মাংসের চিরন্তন কাকুতি থাকে, জিঘাংসা থাকে, লালসা থাকে, তেমনি থাকে মাটির প্রতি টান, সেটাও ওয়ালীউল্লাহ্ মজিদের চরিত্র চিত্রণের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে দেখিয়েছেন। এই ধর্মের কারবারিটিরও পেটের তাগিদে পরিযায়ী হয়ে যাবার বেদনার ব্যাপ্তিকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায়, একটা গভীর অনুভূতির সঙ্গে এখানে তুলে ধরেছেন, যেখানে গভীর রাতে ফেলে আসা বাড়ির ভিটেটার জন্য মজিদের চোখের কোণটা চকচক করে ওঠার বর্ণনা লেখক উপস্থাপিত করছেন।

এ থেকে বোঝা যায় যে যে, প্রকৃতি তে একজন মানুষ যেমনই হোন না কেন, পেটের দায়ে যদি তাকে ভিটেমাটি ছাড়তে হয়, দেশান্তরি হতে হয়, নিজের সঙ্গে একটি বিশেষণ হিসেবে 'পরিযায়ী' শব্দটিকে সংযুক্ত করে নিতে হয় গোটা জীবনের জন্য, তবে সেই মানুষটির ভেতরে যতই সুখ, যত তৃপ্তি, যতই যৌনলালসা পরিতৃপ্ত করবার জৈবিক সুখানুভূতি থাকুক না কেন, শেকড়ের সন্ধানে তার মধ্যে একটা অতৃপ্তি সব সময় কাজ করে।

এই যে ধর্মের কারবারিদেরও মাটির টানে অতৃপ্তির জায়গাটিকে ওয়ালীউল্লাহ্ এখানে ফুটিয়ে তুলছেন, তাঁর ভেতর থেকে কিন্তু যে জিনিসটা খুব পরিষ্কার হয়ে উঠছে তা হলো, মজিদ চরিত্রটির যে যাপনচিত্র গোটা উপন্যাসটিতে আলোচিত হয়েছে, সেই আলোচনার ভেতরে একটিবারের জন্য কিন্তু লেখক নিজের কোনো অভিব্যক্তি চরিত্রটির উপরে চাপিয়ে দেননি। অর্থাৎ চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে লেখক নিজের ভাবনাকে, চরিত্রের ওপর আরোপিত করে, নিজের বোধের দ্বারা চরিত্র চিত্রায়ণের বদলে, বাস্তব থেকে উঠে আসা নিজের দেখা চরিত্রের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যকে তিনি সবসময় বজায় রেখেছেন।

সাধারণভাবে যাঁরা লেখবার চেষ্টা করেন, সাধারণ মাপের লেখা যাঁরা লেখেন, তাঁদের ভাবনায় কেন্দ্রীয় চরিত্র বা অন্যান্য চরিত্রকে উপন্যাসে যদি তাঁরা ইতিবাচকভাবে দেখাবার চেষ্টা করেন তাহলে সেই চরিত্রের মধ্যে কখনো কোনো দোষ তাঁরা খুঁজে পান না। নেতিবাচক কোনো বৈশিষ্ট্যের ছবি তাঁরা আঁকেন না।

আবার যদি কোনো চরিত্র বা কেন্দ্রীয় চরিত্রকে তাঁরা নেতিবাচকভাবে উপস্থাপিত করেন, তাহলে কেবলমাত্র তার নেতিবাচক দিকগুলোকেই সাধারণ মাপের লেখকরা দেখে যান। সেই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রের ভেতরে যেকোনো না কোনোসময়, কোনো ইতিবাচক বা আশা উদ্রেককারী যাপনের ইঙ্গিত থাকতে পারে–এটা তাঁরা কখনোই উল্লিখিত করেন না।

সেই দিক থেকে ওই ধরনের চরিত্রগুলো পড়লে বুঝতে পারা যায়, কল্পিত চরিত্রের কথা তারা লিখছেন চরিত্রগুলোকে দেখে, সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে, মনন দিয়ে, মেধা দিয়ে, সর্বোপরি ভালোবাসা দিয়ে, তাঁরা গড়ে তোলেননি। ওয়ালীউল্লাহ্ থেকে শুরু করে আবু ইসহাক, শওকত ওসমান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রাজিয়া সুলতানা, সেলিনা হোসেন, শওকত আলী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বিভূতি থেকে শুরু করে সমরেশ বসু, এঁরা প্রত্যেকেই চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখিয়েছেন, তা থেকেই বুঝতে পারা যায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু'-এর মজিদের মতো প্রত্যেকটি চরিত্রকে তাঁরা বাস্তবে দেখেছেন। চিনেছেন। জেনেছেন। সেই জানার ভেতর দিয়েই তাঁরা তাঁদের চরিত্রের চিত্রকল্পগুলোকে প্রসারিত করেছেন।

সমরেশ বসুর, 'কোথায় পাবো তারে', যেটা তিনি কালকূট নামের আড়ালে লিখেছিলেন, সেখানে সেই গান গাইয়ে ফকির চরিত্র, গাজী থেকে শুরু করে মাহাতো বউ, আংড়ি–প্রত্যেকটি চরিত্রই যে লালসালুর মজিদের মতোই মাটির পৃথিবী থেকে উঠে এসেছে, রক্তমাংসে দিয়ে সেই চরিত্রগুলো নির্মিত হয়েছে, এগুলো চরিত্রের গহিনে প্রবেশ করলে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি। তাই এই যে পেটের টানে পরিযায়ী হয়ে, ধর্মের সাম্রাজ্য বিস্তার করে, ধর্মকে অধর্ম, অপধর্ম হিসেবে মানুষের মধ্যে প্রসারিত করে, নিজের জন্য একদিকে অর্থ উপার্জন, আরেকদিকে আদিম রিপুকে প্রসারিত করবার যে এক পরস্পর সহাবস্থানরত চরিত্র, সেই চরিত্রটিও যেকোনো একটা জায়গায়, মনের কোনো নিভৃতকোণে, ফেলে আসা মাটি-জল-আগুন-বাতাসের জন্য নীরবে চোখের জল ফেলে–এই যে অনবদ্য মূল্যায়ন, তার ভেতর দিয়েই বোঝা যায়, দুর্জনের মনস্তত্ত্বকেও মানব সমাজের, সামাজিক চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব সহকারে ওয়ালীউল্লাহ্ থেকে শুরু করে ইলিয়াস, সমরেশ বসুরা চিত্রিত করে গেছেন, সেগুলি যদি আমরা ভালোভাবে অনুধাবন না করি, তাহলে কেবলমাত্র বাংলা বা বাঙালির নয়, গোটা মানবসমাজের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের যে বিবর্তন, তা আদৌ আমরা বুঝে উঠতে পারব না। স্পর্শ করা তো দূরের কথা।

মহব্বতনগর গ্রাম যে গ্রামে তাহের আর কাদেরের বাড়ি প্রথমে সেটা বুঝতে না পারলেও কাহিনিসূত্র যত এগোবে ততই ধীরে ধীরে এই চরিত্রগুলোর সঙ্গে পাঠকের একটা নিবিড় পরিচয় ঘটবে। কিন্তু সেই পরিচয়ের সূচনাপর্বে গ্রাম এবং চরিত্র দুটির উল্লেখের ভেতর দিয়েই বুঝতে পারা যায়, ভালোবাসার নামের সঙ্গে সমার্থক এই গ্রামটি ভালোবাসার কি হাহাকার নিয়ে সময়ের বুকে এক নিদারুণ প্রশ্নচিহ্ন উপস্থাপিত করে, নিজেকে কালের দিকচিহ্ন হিসেবে স্থাপিত করেছে। সেই স্থাপনের ভেতর দিয়েই আমরা যেন সময়ের এক অলিগলিতে হেঁটে বেড়াচ্ছি। সেই অলিগলিতে হেঁটে বেড়ানোর ভেতর দিয়ে অতীতের আঙিনায় তার অতীতকে দেখছি। আবার সেই অতীতের প্রতিচ্ছবির মধ্যেই প্রতীয়মান হতে দেখছি ভবিষ্যতের চিত্রগল্পকে।

আমাদের একটিবারের জন্য মনে হবে না এটি হারিয়ে যাওয়া। কোনো সময়ের স্থিরজলে সাঁতার কাটবার প্রচেষ্টা। বরঞ্চ মনে হবে, স্রোতের উজান বেয়ে মানুষের যে সাঁতার, তারই এক অনবদ্য ধারার বিবরণী, যেখান থেকে আমরা সময়কে অতিক্রম করে, দুঃসময়েকে জয় করে, ঝড়ের রাত্রের সেই বিভীষিকা, যা ওই মাজার ঘরটির মধ্যে, মজিদের দ্বিতীয়পত্নীকে অনুভব করতে হয়েছিল। যে অনুভূতির ভেতর দিয়ে মজিদের দ্বিতীয় পত্নী যেন হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ঝড়কে আমি করব মিথের এক সার্থক প্রতিচ্ছবি, তেমনভাবেই যেন আমরা দুঃসময়কে অতিক্রম করে, সুসময়ের প্রতীক্ষায় ফজরের প্রত্যাশায় বসে আছি। এশার বিদীর্ণতা ভেদ করে ফজরের পাখির ডাক আমাদেরকে জানান দিচ্ছে ভোরের আগমনবার্তা। আবার একটা সম্ভাবনার উদয় আমাদের জীবনে ঘটেছে। মানুষের জীবনে ঘটেছে দেশের দশের জীবনে ঘটেছে। •

গৌতম রায়
প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

# শামসুর রাহমান
## কালের ধুলোয় অমলিন

কুমার দীপ

‘তখন নিচুক্লাসে পড়ি। একদিন ইশকুলে এসে ক্লাসরুমে বসেছিলাম যথারীতি। হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল। কিসের ছুটি? রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন, সে জন্য ছুটি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা শুনে দুঃখিত হইনি বিন্দুমাত্র, বরং ছুটি পাওয়া গেল বলে আনন্দিত হই। রবীন্দ্রনাথ এবং মৃত্যু–উভয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন ছিলাম, তাই সেদিন অমন একটি সবদিক অন্ধকার করে দেয়া সংবাদ শোনার পর বই বগলদাবা করে, শব্রি আম খেতে খেতে হাসিখুশি বাড়ি ফিরছিলাম।’ –এই স্বীকারোক্তি জীবনানন্দপরবর্তী বাংলা কবিতার অন্যতম নক্ষত্র শামসুর রাহমানের। কাব্যিক ঐশ্বর্যের নান্দনিকতায় অনন্য এই কবির পারিবারিক কিংবা পারিপার্শ্বিক বিশেষ কোনো সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ছিলো না। আত্মজীবনী ‘কালের ধুলোয় লেখা’তে কবি নিজেই বলেছেন–‘আমি মানুষ হয়েছি সাহিত্যছুট পরিবেশে

অসাম্প্রদায়িক চেতনা পরিপুষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে পিতার পরেই ছিলো কবির বাল্যবন্ধু সূর্যকিশোর আর দুই প্রিয় শিক্ষক আবদুল আউয়াল ও চিন্তাহরণ সোম-এঁর অবদান। শামসুর রাহমান লিখেছেন–'একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আজ আমি একজন প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হয়ে উঠতে পেরেছি, তার ভিত্তিভূমিটি রচনা করেছিলেন আমার ছেলেবেলার গৃহশিক্ষক আবদুল আউয়াল। এই প্রসঙ্গে পোগোজ স্কুলের শিক্ষক চিন্তাহরণ সোমের কথা না বললে ঘোরতর অন্যায় হবে

আমাদের পরিবারে সঙ্গীত ও চিত্রকলা সম্পর্কে কারও কোনও আগ্রহ ছিল না।' ঢাকা শহরের যে-এলাকায় কবির শৈশব-কৈশোরের ধুলো উড়েছে, সেই মাহুতটুলি এলাকায় তখন ঢাকাইয়া সংস্কৃতি বলতে ছিলো উর্দু কাওয়ালি আর মেরিসানের গান। অন্যদিকে কবির বাড়িতে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে 'কোরান শরীফ' এবং 'বিষাদ সিন্ধু' ছাড়া অন্য কোনও বইয়ের প্রবেশাধিকার ছিলো না। আফ্‌শোসের সুরেই শামসুর লিখেছেন–'আমি ঈর্ষা করি আজকের ছেলেমেয়েদের, যাদের কাছে সহজলভ্য সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল', 'খাই খাই', 'হযবরল', উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'টুনটুনির বই', 'ছোটদের রামায়ণ', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল', 'নালক', 'রাজকাহিনী', ইত্যাদি বই।' এরকম প্রতিকৌলিক পারিপার্শ্বিকতা উজিয়ে বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলা কবিতার দিকে ঝুঁকেছিলেন শামসুর রাহমান। হয়ে উঠেছিলেন সম্পূর্ণ আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক চৈতন্যের এক অসামান্য প্রগতিশীল বাঙালি। কীভাবে সম্ভব হয়েছিল এমন সুপ্রকাশের?

## উজ্জ্বল আলোকরেখাটিও লুকিয়ে থাকে নিকষ আঁধারে

আপাত অন্ধকার বলে মনে হলেও শামসুর রাহমানের পারিবারিক মূল্যবোধের মধ্যেই সুপ্ত ছিলো উজ্জ্বল আলোর প্রথম সংকেত। শিল্প-সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হওয়ার প্রথম সূত্র হলো কূপমণ্ডুকতা পরিহার করে অসাম্প্রদায়িক চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলা। কবির পিতা মোকলেসুর রহমান চৌধুরী রক্ষণশীল প্রকৃতির হলেও ছিলেন অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। কবি জানাচ্ছেন–'অসাম্প্রদায়িক হবার শিক্ষা পেয়েছি আব্বার কাছে। তিনি কখনও হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে আমাদের সামনে বড় করে তুলে ধরেননি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই যে এক মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত এটা তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন। মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারাটাই ছিল তাঁর কাছে প্রধান বিবেচ্য।' দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া বাবার এই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রন্থপাঠ থেকে আসেনি, আবহমান বাংলার পরিপার্শ্ব থেকে সহজাতভাবে প্রবেশ করেছিল। এ-কারণে শৈশব-কৈশোরে একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হতে দেখলেও কবির জীবনে তার প্রভাব পড়েনি।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা পরিপুষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে পিতার পরেই ছিলো কবির বাল্যবন্ধু সূর্যকিশোর আর দুই প্রিয় শিক্ষক আবদুল আউয়াল ও চিন্তাহরণ সোম-এঁর অবদান। শামসুর রাহমান লিখেছেন–'একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আজ আমি একজন প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হয়ে উঠতে পেরেছি, তার ভিত্তিভূমিটি রচনা করেছিলেন আমার ছেলেবেলার গৃহশিক্ষক আবদুল আউয়াল। এই প্রসঙ্গে পোগোজ স্কুলের শিক্ষক চিন্তাহরণ সোমের কথা না বললে ঘোরতর অন্যায় হবে। তিনি একজন ভালো শিক্ষক তো ছিলেনই, অসাম্প্রদায়িক চেতনায়ও ঋদ্ধ ছিল তাঁর চিত্ত।' পরবর্তীতে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে চলে যাওয়া গৃহশিক্ষক আবদুল আউয়ালের প্রগতিশীল কথাবার্তা, সাম্যবাদী আদর্শ, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনা কিশোর কবিমনে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। এই শিক্ষকের কারণে 'অনেকের কাছে যা ছিল স্বতঃসিদ্ধ তা মেনে নেওয়ার প্রবণতা' রাহমানের মন থেকে উধাও হতে শুরু করল। আর পোগোজ স্কুল, যেখানে ৮০০ ছাত্রের ভেতরে মাত্র ১০ জনের মতো মুসলিম ছিলো, সেই বিরূপ পরিবেশে অসাধারণ সুন্দর ইংরেজি পড়ানো শিক্ষক চিন্তাহরণ সোম কবিকে স্নেহভরে কাছে টেনে নিয়েছিলেন এবং বাইরের বই পড়ার সুযোগ দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ওঠার মন্ত্র দিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'শামসুর রাহমানের গদ্যসংগ্রহ' গ্রন্থের একান্ত ভাবনা নামক আত্মস্মৃতিতে 'আমার মাস্টারমশাই' শিরোনামে চিন্তাহরণ সোমকে নিয়ে লিখেছেন–'শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ সোমের স্মৃতি আমার মনে অত্যুজ্জ্বল।' 'পাথ অব পিস' বইটি পড়তে দেখা ব্যতিক্রম, নিঃসঙ্গ এই শিক্ষক সম্পর্কে কবি লিখেছেন–'আমি একথা নির্দ্বিধায় বলবো, আমার মাস্টারমশাই, চিন্তাহরণ সোমের মতো আদর্শবান শিক্ষক দুর্লভ।'

আর সবচেয়ে আপনজন যিনি, সেই মায়ের নিকট থেকে পেয়েছিলেন মিথ্যা না-বলার শিক্ষা। শৈশবে মা বলেছিলেন–'জীবনে কখনও মিথ্যা বলো না।'

## কবিতার দিকে মুখ

বাবুর বাজারের চিত্রকর নঈম মিয়ার আঁকা দুলদুল ঘোড়াসহ বিভিন্ন ছবি দেখে মুগ্ধ শামসুর রাহমান ছবি আঁকা শিখতে চাইলেও শিল্পীর কঠিন ও করুণ পরিণতির কথা বলে বালক শামসুরকে চিত্রশিল্পী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত রেখেছিলেন ওই শিল্পী। তবে পোগোজ স্কুলে পড়ার সময় 'এক টুকরো কয়লার আত্মকাহিনী' প্রবন্ধ লিখে অন্যের নজর কাড়া কিংবা 'দুর্ভিক্ষ' বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে মনীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য স্যারকে ব্যাপক খুশি করতে পারা... এগুলোকে বলা যেতে পারে শামসুর রাহমানের লেখালিখির ভ্রূণ। এরপর বসন্ত রোগে ছোটো বোন নেহার মৃত্যু ৭ম শ্রেণিতে পড়া কবি প্রচণ্ড আহত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছিন্ন মুকুল' কবিতাটির ছায়া অবলম্বনে লিখে ফেলেন একটি শোকগাথা, যা পড়ে শোনালে কবির মা খুব কেঁদেছিলেন। তবে কবিতার দিকে শামসুরের যাত্রাটা শুরু হয় ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময়ে। এখানে তিনি বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের বক্তব্যে মুগ্ধ হয়েছেন, বন্ধু হিসেবে পেয়েছেন জিল্লুর রহমানকে (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি), যিনি কি না শামসুর রাহমানকে 'আপনি কি লেখেন?' প্রশ্ন করে লিখতে না শুরু করা একটা ছেলেকে পরোক্ষভাবে লেখার জন্য উসকে দিয়েছিলেন। ঢাকা কলেজের আরেক শিক্ষক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, যিনি বিখ্যাত 'হারামণি'র সংগ্রাহক, বাংলা পড়াতেন, শামসুর রাহমানকে শুধু স্নেহ করতেন না, সদ্য কবিতার জগতে পা রাখা এই কবির কবিতারও ভক্ত ছিলেন। একবার কবিকে একটি লাল গোলাপ দিয়েছিলেন কবিতার জন্য। আত্মজীবনীতে রাহমান বলেছেন, 'তিনি যখন সস্নেহে একটি রক্ত গোলাপ আমার হাতে তুলে দিয়েছেলেন, তখন আমি কোনও পুরস্কারই পাইনি। পরবর্তী জীবনে আমি বহু পুরস্কার পেয়েছি। সেসব পুরস্কারের সবগুলোর কথা আমার মনেও পড়ে না, অথচ হারামণি গ্রন্থের প্রণেতা প্রদত্ত গোলাপটির কথা কস্মিনকালেও ভুলব না।' এইসময়ে কাছে ডাকছেন শিল্পী হামিদুর রহমান। এবং এই হামিদুর রহমানের বাসার সাংস্কৃতিক আড্ডায় একে একে কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ, চিত্রকর

বয়সে দুবছরের ছোটো হলেও লেখালিখির জগতে সিনিয়র; স্নিগ্ধ ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার এই কবি ও সম্পাদকের সঙ্গে আজন্ম প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিলো শামসুরের। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীসহ আরও অনেক ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এই কলেজ অধ্যয়নকালেই। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে সম্মান ভর্তি হওয়ার পরে বন্ধু হিসেবে পান জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে। এই বন্ধুর নিকট থেকে জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' ধার নিয়ে সারা রাত জেগে পড়েছিলেন

আমিনুল ইসলাম ও মুর্তজা বশীর, কবি বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আশরাফ আলী প্রমুখ পরবর্তীকালের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎ পান এবং বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। আশরাফ আলীর ইংরেজি সাহিত্যের সংগ্রহ ও বিভিন্ন ইংরেজ কবির কবিতা আবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে পরবর্তীতে ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চতর পড়ালেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন রাহমান। হামিদুর রহমানের বাসাতেই দেখেছিলেন রবীন্দ্র রচনাবলির সুদৃশ্য সেট। এই হামিদের তাগিদেই প্রথম কবিতা পাঠিয়েছিলেন পত্রিকায়। সেকথা স্মরণ করে শামসুর লিখেছেন,

'সোনার বাংলা'য় এক সময় জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অন্যান্য নামজাদা লেখক লিখতেন। আমার অক্ষম লেখা কে ছাপাবে, একথা হামিদকে বললেই সে জবাব দিত, 'পাঠিয়েই দেখ না, আমার বিশ্বাস, লেখা ছাপা হবেই।' কী আশ্চর্য, আমার কবিতা ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি 'সোনার বাংলা'য় প্রকাশিত হলো। সেই দিনটি আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে রয়েছে। সেদিন আমার চেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিল হামিদ। [কালের ধুলোয় লেখা]

'সোনার বাংলা'য় কবিতা মুদ্রিত হওয়ার সূত্র ধরেই রাহমানের জীবনে আসেন আরেক বিখ্যাত বন্ধু, হাসান হাফিজুর রহমান। বয়সে দুবছরের ছোটো হলেও লেখালিখির জগতে সিনিয়র; স্নিগ্ধ ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার এই কবি ও সম্পাদকের সঙ্গে আজন্ম প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিলো শামসুরের। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীসহ আরও অনেক ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এই কলেজ অধ্যয়নকালেই। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে সম্মান ভর্তি হওয়ার পরে বন্ধু হিসেবে পান জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে। এই বন্ধুর নিকট থেকে জীবনানন্দ দাশের 'রপসী বাংলা' ধার নিয়ে সারা রাত জেগে পড়েছিলেন। রাহমানের তখনকার অনুভূতি ছিলো–'এরকম কবিতা আমি আগে কখনও পড়িনি। এরপরই আমি জীবনানন্দ দাশের অনুরক্ত হয়ে পড়ি।' শুধু জীবনানন্দ নয়, ধীরে ধীরে পুরো কাব্যজগৎ, বিশেষ করে তিরিশের কবিতার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন কবি। এবং নিজের কবিতানিমগ্নতাও এমন পর্যায়ে পৌছায় যে, অনার্স পরীক্ষা দেওয়া হয় না এবং একাধিকবার খামখেয়ালিপনার জন্য ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ডিগ্রিও অর্জন করা সম্ভব হয় না। পরে পাশ কোর্স থেকে বিএ উত্তীর্ণ হয়ে এমএতে ভর্তি হওয়ার পরে প্রথম পার্ট পরীক্ষা দিলেও দ্বিতীয় পার্ট পরীক্ষা না-দিয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করেন। বলা যায়, কবিতার জন্য একটি সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার গঠনের হাতছানি অবহেলা করে এক অনিশ্চয়তার জীবনে প্রবেশ করেন কবি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির শিক্ষক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর আহ্বানে 'কয়েকটি দিন, ওয়াগনে' শিরোনামে দেশবিভাগের সূত্র ধরে পশ্চিম বাংলা থেকে আসা কিছু রিফিউজি, যারা রেলের পরিত্যক্ত ওয়াগনে থাকত, তাদের নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন শামসুর রাহমান। কবিতাটি নিজের প্রকাশিতব্য পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আরেক স্যার সৈয়দ নুরুদ্দিন তরুণ কবিকে ২৫ টাকা সম্মানী দিয়েছিলেন, পরে এই কবিতাটি অনিল সিংহ সম্পাদিত, কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আরও পরে গান আকারে এটি পাকিস্তান রেডিওতে গীতও হয়। ১৯৫০ সালে আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পূর্ববাংলার প্রথম আধুনিক কাব্যসংকলন 'নতুন কবিতা', শামসুর রাহমান যে-সংকলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তরুণ কবি। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত 'সংস্কৃতি সংসদ'-এ এবং পরে 'প্রগতি লেখক সংঘ'-র আয়োজনে বিভিন্ন আসরে বিখ্যাত সব ব্যক্তির সম্মুখে কবিতা পড়তেন শামসুর রাহমান। 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘের' শেষ সভাতে পড়া 'কোনও এক নিমগ্ন শহরকে' কবিতা শুনে মুস্তফা নূর-উল ইসলাম বলেছিলেন, 'আজ থেকে আমাদের কবিতা নতুন মোড় নিল। এই কবিকে ধন্যবাদ জানাই।'

## কবিতা, বুদ্ধদেব বসু এবং স্বীকৃতির রোদে

কোনো এক ভোরে সমাপ্ত হওয়া 'রূপালি স্নান' কবিতাটি নিয়ে আনন্দচিত্তে 'দৈনিক সংবাদে'র সাহিত্য সম্পাদকের টেবিলে জমা দিয়ে আসেন শামসুর। ততদিনে এই পাতায় বেশকিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে কবির। সাহিত্যপাতার দায়িত্বে ছিলেন কবি আবদুল গনি হাজারী। কিন্তু পরের দিন সংবাদের অফিস থেকে ডাক এলে সাহিত্য সম্পাদকের উপস্থিতিতে সম্পাদক খায়রুল কবির কবিতাটির পাণ্ডুলিপি কবির দিকে দিয়ে জানালেন, লাল কালি চিহ্নিত শব্দগুলো বদলে দিলে ছাপানো যেতে পারে। শামসুর রাহমান তখন আবেগী; কিছুটা রুষ্টতাসহ কম্পিত স্বরে বললেন, 'আমি শব্দগুলো বদলাব না।' এরপর কবিতাটি 'দৈনিক সংবাদ' থেকে ফেরত এনে হুবহু আরেকটি কপি করে বন্ধু কায়সুল হকের কথা স্মরণ করে সে-যুগের বিখ্যাত কবি-সম্পাদক-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বরাবর পাঠিয়ে দিলেন কবিতাটি। এ-প্রসঙ্গে কবির নিজের জবানিটাই চমৎকার :

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, 'রূপালি স্নান'-এর কয়েকটি জায়গা লাল কালি লাঞ্ছিত হওয়ায় আমি অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। তবে এই অপ্রীতিকর ঘটনাটি আমার জন্য শাপে বর হয়েছিল। সেই ক্ষতবিক্ষত পাণ্ডুলিপি ফেরত নিয়ে এসেই আমি তাড়াতাড়ি 'রূপালি স্নান'-এর একটি নতুন কপি করে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার ঠিকানা ২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯-এ রওনা করে দিলাম। মনে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছিল কবিতা বিষয়ে। কিন্তু আমাকে অবাক এবং উৎফুল্ল করে দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই খোদ বুদ্ধদেব বসুর একটি চিঠি পেলাম। [ কালের ধুলোয় লেখা ]

এরপর ইতিহাস। বিখ্যাত 'কবিতা'য় একে একে ছাপা হতে থাকল অখ্যাত তরুণ কবির একটির পর একটি কবিতা। এমনকি বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অশোকবিজয় রাহা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, অরুণ কুমার সরকার প্রমুখের কবিতা থাকা সত্ত্বেও শামসুর রাহমানের 'মনে মনে', ও 'তার শয্যার পাশে' কবিতাদুটি দিয়েই শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সালের জুন মাসের 'কবিতা' সংখ্যাটি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর বিখ্যাত 'পূর্বাশা' পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা শুরু করতেন একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দিয়ে। একবার শামসুর রাহমানের 'এ্যাপোলোর জন্যে' কবিতাটি দিয়েই শুরু হয়েছিল একটি সংখ্যা। একথা স্মরণ করে রাহমান লিখেছেন, 'আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি বুদ্ধদেব বসু এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো সাহিত্যস্রষ্টা ও গুণীজনের প্রশংসা এবং স্বীকৃতি পেয়েছি একজন তরুণ কবি হিসেবে।' বলা বাহুল্য,

এসব স্বীকৃতি শামসুর রাহমানকে কেবল উদ্দীপ্তই করেনি, যারা তাকে চিনতে ও বুঝতে দ্বিধান্বিত ছিলেন, তাদের কাছেও কবির পরিচয়টিকে সম্ভ্রমের জায়গায় উন্নীত করেছিল। এবং রাহমান নিজেও গভীর মনোযোগে কবিতার নান্দনিক সাগরে নিমগ্ন হওয়ার অসঙ্কোচ প্রেরণা পেয়েছিলেন।

## স্বপ্ন যখন সমুদ্র হওয়ার

কবিতাই ছিল শামসুর রাহমানের ধ্যান-জ্ঞান। কবিতাচর্চায় বিঘ্ন ঘটতে পারে বিধায় রাজনীতি ও সংগঠন থেকে দূরে থাকতেন তিনি। লেখার সময় যাতে অলসতা বা নিদ্রা পেয়ে বসতে না পারে, সেজন্য বসে বসেই লিখতেন তিনি। আত্মজীবনীতে লিখেছেন–'জীবনে লেখাকেই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। কখনও ঘরের কোণে টেবিলে ঝুঁকে, কখনও-বা বিছানায় শুয়ে বালিশে বুক পেতে লিখতাম...। বিছানায় গা এলিয়ে লেখার বিলাসিতাটুকু বর্জন করেছি ঘুমের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়।' কবিতার প্রতি অপরিমেয় নিষ্ঠাসহ কাব্যদেবীকে প্রেমে-বিরহে-আবেগে বেঁধেছেন শামসুর রাহমান। কখনও প্রেমিকা, কখনও দেবী রূপে কবির হৃদয়ে ধরা দিয়েছেন তিনি। কবি সাদা খাতার পিঠে একের পর এক এঁকে গেছেন কাব্যদেবীর রূপলাবণ্য। অসীম ব্যাকুলতা আর উদ্বিগ্নতায় রাতের রাতের পর রাত জেগে, হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে যে কাব্য রচনা করেছেন তিনি, তা কি সত্যিই অক্ষয় কাব্যকুসুম হয়ে টিকে থাকবে, না কি মিলিয়ে যাবে কালের স্রোতে?–এমন প্রশ্নও নিজেকে করেছেন। বলেছেন, 'কাল যে বড় নির্দয়, বড় উদাসীন। তবু যে লেখনীকে সক্রিয় রাখতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি তার কারণ, সাধনায় আমি বিশ্বাসী।' কোনো উপেক্ষা কিংবা অবহেলা কাব্যলক্ষ্মী যে দূরে সরে যান, একথা ভালোভাবেই জানতেন শামসুর।

বেকারত্বের বেদনায় বিমর্ষ ও হতাশাগ্রস্ত, দিনগুলোতেও কবিতা থেকে দূরে থাকেননি, কলমকে ঝিমানোর সুযোগ দেননি। প্রায় প্রতিদিনই কবিতার কথা ভেবেছেন, পঙ্‌ক্তিমালা সাজিয়েছেন সাদা কাগজে। কখনো কখনো কলম বিদ্রোহ করে বসেছে, কিন্তু সেই ক্ষণিক বিদ্রোহকে আমল না দিয়ে লিখে গেছেন দিনের পর দিন। সাময়িক মোহ-আবেগকে সংযত রেখে ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে কবিতাচর্চা অব্যাহত রাখতে পেরেছেন বলেই হতাশার অন্ধকারেও কবিতা দিয়েছে আলোর সন্ধান। সুদীর্ঘ সময় ধরে কাবচর্চার প্রতি নিবিষ্ট থাকবার রসদ কবি পেয়েছিলেন নানাগ্রন্থের সাহচর্য, দূরের স্বপ্ন, সুহৃদদের সহানুভূতি ও বরাভয় আর বাবা-মায়ের অকৃত্রিম স্নেহ ও সহনশীলতা থেকে। আর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ। বাল্য বয়সে যে-রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু শামসুর রাহমানকে ন্যূনতম ভাবায়নি, স্কুল ছুটির আনন্দে শব্রি আম খেতে খেতে বাড়ি ফিরেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথই তাঁর অনিঃশেষ প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিলেন পরিণত বয়সে। 'রৌদ্র করোটিতে' কাব্যের 'যখন রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় লিখেছেন–

আমার দিনকে তুমি দিয়েছ কাব্যের বর্ণচ্ছটা
রাত্রিকে রেখেছো ভ'রে গানের স্ফুলিঙ্গে, সপ্তরথী
কুৎসিতের ব্যূহ ভেদ করবার মন্ত্র আজীবন
পেয়েছি তোমার কাছে। ঘৃণার করাতে জর্জরিত
করেছি উন্মত্ত বর্বরের অট্টহাসি কী আশ্বাসে।

প্রতীকের মুক্ত পথে হেঁটে চলে গেছি আনন্দের
মাঠে আর ছড়িয়ে পড়েছি বিশ্বে তোমারই সাহসে।
অকপট নাস্তিকের সুরক্ষিত হৃদয় চকিতে
নিয়েছ ভাসিয়ে কত অমলিন গীতসুধারসে।
ব্যাঙডাকা ডোবা নয়, বিশাল সমুদ্র হতে চাই।

সত্যিকার অর্থেই, বাংলা কবিতার, বিশেষত বাংলাদেশের কবিতার সমুদ্র হয়ে উঠেছেন শামসুর রাহমান। এই সমুদ্র হয়ে ওঠার সংগ্রামমুখর পথ পরিক্রমার অনুপম দলিল কবিলিখিত 'কালের ধুলোয় লেখা'; যা সংস্কৃতিবান বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছে কালের ধুলোয় অমলিন এক আলেখ্যরেখা। শামসুর রাহমানের জীবনব্যাপী কাব্যসাধনার অনন্য স্মারক। •

কুমার দীপ
কবি ও প্রাবন্ধিক

## ঘটনাপঞ্জি ❖ আগস্ট

বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই

| | | |
|---|---|---|
| ০১ আগস্ট ১৯৩২ | ❖ | বলিউড অভিনেত্রী মীনাকুমারীর জন্ম |
| ০২ আগস্ট ১৮৬১ | ❖ | আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম |
| ০৪ আগস্ট ১৯২৯ | ❖ | কিশোরকুমারের জন্ম |
| ০৭ আগস্ট ১৮৬৮ | ❖ | প্রমথ চৌধুরীর জন্ম |
| ০৭ আগস্ট ১৯২৫ | ❖ | কৃষিবিদ এমএস স্বামীনাথনের জন্ম |
| ০৭ আগস্ট ১৯৪১ | ❖ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু |
| ১১ আগস্ট ১৯০৮ | ❖ | ক্ষুদিরামের ফাঁসি |
| ১২ আগস্ট ১৯১৯ | ❖ | বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের জন্ম |
| ১৫ আগস্ট ১৮৭১ | ❖ | ঋষি অরবিন্দের জন্ম |
| ১৫ আগস্ট ১৯২৬ | ❖ | কবিকিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম |
| ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ | ❖ | ভারতের স্বাধীনতা দিবস |
| ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ | ❖ | অভিনেতা রাখি গুলজারের জন্ম |
| ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ | ❖ | রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মৃত্যু |
| ১৮ আগস্ট ১৯৩৬ | ❖ | হিন্দি গীতিকার পরিচালক গুলজারের জন্ম |
| ২০ আগস্ট ১৯১২ | ❖ | জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জন্ম |
| ২০ আগস্ট ১৯৪৪ | ❖ | রাজীব গান্ধীর জন্ম |
| ২৮ আগস্ট ১৮৫৫ | ❖ | স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম |
| ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ | ❖ | কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু |
| ৩১ আগস্ট ১৫৬০ | ❖ | মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্ম |

ধারাবাহিক উপন্যাস

# বহ্নিলতা

অমর মিত্র

গাঙের উপরে মেঘ উঠলে গাঙের যেমন রং হয়, বালিকা তেমনি। বনের উপর মেঘ উঠলে বনে যেমন ছায়া ঘনায়, বালিকা তেমনি। বনের দিকে চোখ মেলে দিলে যেমন বুক ঝিমঝিম করে, মেয়ে তেমনই। তার নাম লতা। বনলতা, সুন্দরবনের লতা। ভালোবেসে জড়িয়ে থাকে, আঁকড়ে থাকে। সুশান্ত আর বহ্নিশিখা তার নাম দিয়েছিল বহ্নিলতা। বহ্নিলতা মৃধা। সুশান্তর স্ত্রী বহ্নিশিখার সঙ্গে লতার মতো জড়িয়ে থাকা মেয়ে। অগ্নিলতা, বহ্নিলতা দেখেছিল তারা পুরুলিয়ার কোনো এক শৈলশ্রেণির গায়ে বসন্ত কালে। কাঠুরেরা কাঠ কাটতে আদিবাসীরা শিকার করতে পাহাড়ি পথ তৈরি করতে, কাঠ কয়লা সংগ্রহ করতে আগুন লাগিয়ে দেয় পাহাড়ের গায়ের বনভূমিতে। অনেক সময় শুকনো পাতার ঘষাঘষিতেও আগুন লাগে। দাবানল। সেই আগুন অনেকদিন ধরে জ্বলে। লতার মতো লতিয়ে ওঠে পাহাড়ের গায়ে। সেই অগ্নিরেখা তাদের, সুশান্ত আর বহ্নিশিখাকে অবাক করেছিল। মুক্তির রেখা যেন। মানুষের মুক্তি হবেই। বহ্নিলতাকে নিয়ে আবার সেই যৌবনের আগুন যেন ফিরে এসেছিল তাদের নীরক্ত পরাস্ত জীবনে। অগ্নিলতা। সেই বহ্নিলতার বনলতা নামটি দিয়েছিল তার ঠাকুদ্দা নিতাইহরি। শ্রীহরির কাছে সমর্পিত নিতাইহরি বাংলাদেশের সাতক্ষীরের নিকটবর্তী বড়দলের বাসিন্দা ছিল। সেখানে কপোতাক্ষ নদ

সেই বছর তাদের দুবিঘে জমির ধান নষ্ট হয়নি ঝড়-বৃষ্টিতে। অঘ্রানের ধান সবটাই ঘরে উঠল, শীতের সব্জি, পালং আর ফুলকপি হয়েছিল অনেক। বাবা মাঝে মাঝে নাও নিয়ে গহিন গাঙে চলে যেত, ভালো মাছ পেত। বিক্রির পর ঘরের জন্য কিছু রাখত। লইট্যা মাছ, আমাদি মাছ, চিত্রে মাছ, গাঙ-ভেটকি...গর্ভবতী মা খেতে পেত। সেই বছর সংসারে সুখ এসেছিল

সেই কালে সেই নদে স্টিমার চলত। বহ্নিলতা সব জানে। কী করে জানে? তার জন্ম তো ১৯৯৫-এ। ৯৫-এর এক বসন্তদিনে, ফাগুন মাসে, যখন বনে বনে ফুল ফুটেছে, সে মা পুষ্পরানির কোলে এসেছিল। সেই ফাগুনেই তাদের ভিটের পিছনে মস্ত আম গাছটিতে বড় এক চাক হয়েছিল মধুর। ভিনদেশি মৌমাছিরা চাক বেঁধেছিল। সেই মধুর ভিতরে যে ফুলের গন্ধ পেয়েছিল ঠাকুরদা নিতাইহরি, তা নাকি তাদের দণ্ডকারণ্যের সেই গ্রাম বিরামপুরার পাহাড়ে ছিল। বড় গাছে বড় বড় ফুল, ঠাকুরদা বলত হরির দেওয়া হরিপুষ্প। মৌমাছিরা ঘুরে ঘুরে এসেছিল সেই উষরভূমি, নিদয়া অহল্যাভূমি থেকে। তারা ফুলের কাছে আসার আগে মানুষের কাছে আসে। গুনগুন করে বহ্নিলতা...

পতঙ্গ হইতে হইল মধুর জনম
মধু পেইয়ে তুষ্ট হইল
যতো দেবগণ।
মধুর মতন আর মধু নাহি ভবে
মধু লাগে সর্বদেব
দেবীর উৎসবে।

সেই বছর তাদের দুবিঘে জমির ধান নষ্ট হয়নি ঝড়-বৃষ্টিতে। অঘ্রানের ধান সবটাই ঘরে উঠল, শীতের সব্জি, পালং আর ফুলকপি হয়েছিল অনেক। বাবা মাঝে মাঝে নাও নিয়ে গহিন গাঙে চলে যেত, ভালো মাছ পেত। বিক্রির পর ঘরের জন্য কিছু রাখত। লইট্যা মাছ, আমাদি মাছ, চিত্রে মাছ, গাঙ-ভেটকি...গর্ভবতী মা খেতে পেত। সেই বছর সংসারে সুখ এসেছিল। সুখ এসেছিল সে মায়ের পেটে আসার পর। কবিতা-বহ্নিলতা শুনেছে সব কথা তার মায়ের কাছে। আরো কথা শুনেছে তার বাবার কাছে। আরো কথা তার ঠাকুরদার কাছে। ঠাকুরমার কাছে। ঠাকুরদা নিতাইহরি পারটিশনের সময় ওপার থেকে চলে এসেছিল। ওপারে তাদের তেমন কিছু ছিল না, আর ঘর পুড়েছিল দাঙ্গায়। তখন বহু মানুষ দেশত্যাগ করছিল, তারাও ছেড়ে এসেছিল বাঁকা-ভবানীপুর। কপোতাক্ষ নদ সেখানে বেঁকেছিল অষ্টমীর চাঁদের মতো করে।

তুই এত কথা জানলি কী করে লতা? সন্ধেয় বহ্নির সঙ্গে কথা হয় বহ্নিলতা কবিতার। তখনো সুশান্ত ফেরেনি তার প্রকাশনা থেকে। ফিরতে তার রাত হয়। বহ্নিশিখা প্রাইমারি ইস্কুলে পড়ায়, বিকেলের আগেই ফিরে আসে। তিন ঘণ্টা পড়ানো, দুঘণ্টা মিড-ডে মিল। বাচ্চারা সব গরিব মা বাপের। ভাত না পেলে ইস্কুলে আসতই না।

লতা বলে, আমি যেন সব দেখেছি মনে হয় মা।

মা ডাকটি শুনলে বুক জুড়োয় বহ্নিশিখার। কিন্তু সুশান্ত তার পিসে। সুশান্তই বলেছে, তুই পিসে বলতে পারিস, মেসো বলতে পারিস, জেঠা, কাকা বলতে পারিস। বাবা নয়।

বাবা নয় কেন? আহা, বহ্নিলতার বাবা তো রয়েছে সেই সাত নদী পেরিয়ে মথুরগঞ্জে। ওরা খুব দুঃখ পাবে। ভাববে ওদের মেয়েকে আমরা নিয়ে নিয়েছি সারা জীবনের মতো।

দেশভাগ হলে যুবক নিতাইহরি চলে আসে এপারে। এপারে এসে কিছু করতে না পেরে চলে গিয়েছিল দণ্ডক অরণ্যে। সেখানে জমি পেয়েছিল, কিন্তু সে জমিতে চাষ হতো না। পাথর পাথর। পাথর ভেঙে ভেঙে নিতাইহরি অকালে বুড়ো হয়েছিল।

সে তুমি ভাবতে পারবে না মা, জল নাই, জলের কী অভাব, অনেক দূরে একটা ঝর্না ছিল, তা নদী হয়ে নেমেছিল নিচে, সেই জল ভরসা, জলকে ওদেশে পানি বলে, আমার ঠাকমা পানি আনতে যেত কলসি নিয়ে, আমার বাবাও পানি টানত, ইঁদারার জল শুকিয়ে যেত মাঘ মাস থেকে, টিনের বাড়ি কী গরম হতো গরমের সময়, সে খুব কঠিন দেশ ছিল মা।

কঠিন দেশ, কে বলেছিল এ কথা?

আমার বাবা, কঠিন বটে, পানি নাই, ছায়া নাই, পাহাড় দেখা যেত অনেক দূরে, নীল পাহাড়।

বহ্নিশিখা বলে, তুই এমন ভাবে বলিস, যেন তুই সব দেখেছিস।

হাসে কালো মেয়ে, বলে, হ্যাঁ গো মা, আমার মনে হয় আমি দেখেছি সব, সেই বিরামপুরা, সে দেশে কাঁঠাল হয় ভালো, আমাদের ভিটেয় কাঁঠাল গাছের ছায়া ছিল, ছায়ায় বসে ঠাকমা বলত সেই বাঁকা গাঁয়ের কথা, কপোতাক্ষ নদের কথা, কপোতাক্ষ নদের ধারেই তো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম, কবি মাইকেল মধুসূদনের জন্ম, আমিও জন্মাতাম সেখেনে যদি না ঠাকুরদা চলে আসত, সেই গাঙের জন্যি আমার মন কেমন করে মা, সত্যি বলছি।

কী কথাই বলে বহ্নিলতা। শুনলে প্রাণ জুড়োয়। যে নদী যে গ্রাম সে দ্যাখেনি, তার জন্য তার মন খারাপ হয়। সেই বিরামপুরার জন্যও মন খারাপ লাগে। মা, সেই যে নীল পাহাড়, তা নাকি চিত্রকূট, সে দেশ নাকি রামায়ণের দেশ। রামের বনবাস হয়েছিল সেই দেশে।

তোর ঠাকুরদা তাহলে চলে এলো কেন? জিজ্ঞেস করেছিল বহ্নিশিখা।

ও মা, কেন আসবে না, খুব কষ্ট যে, আমরা আস্তে আস্তে ওদের মতো হয়ে যাচ্ছিলাম, আমাদের মতো থাকছিলাম না, ঠাকমা কাঁদত তার গাঙের জন্যি, বৃষ্টির জন্যি, সে দেশে এত কম বৃষ্টি হয়!

আমাদের দেশের মতো এত জল, পুকুর নদী, নরম মাটি আর কোথায় পাবে বলো, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

হুঁ, কিন্তু ঠাম্মা যে সেই কঠিন মাটির বিরামপুরার জন্যও মন খারাপ করত, উঠনে দাঁড়িয়ে নীল পাহাড় দেখা যেত, ঠাম্মার মায়া পড়ে গিইছিল সে দেশের জন্যিও। বহ্নিলতা, লতা।

নিতাইহরির ছেলে বলাইহরি বাপ-মাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল মরিচঝাঁপি। তখন বলাই বছর পনেরো। বছর পনেরোতেই সে বলশালী। বলেছিল, পোড়ার দেশে থাকব না। মরিচঝাঁপিতে মার খেয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এক দ্বীপে। নাম জানে না। সাপে কেটে মরেছিল কতজন। এক মাঝি তাদের উদ্ধার করে গাঙ পার করে হ্যামিল্টনগঞ্জ, যোগেশগঞ্জ হয়ে সেই দ্বীপে নিয়ে যায় যেখানে যে মথুরগঞ্জে কবিতা জন্মেছিল। কবিতার মা পুষ্পরানি দুবছর বয়সে মথুরগঞ্জে এসেছিল বরিশাল থেকে গাঙে ভেসে ভেসে। সেই গাঙের একুল নেই ওকুল নেই। সমুদ্রে বিলীন হয়েছে তা আরো দক্ষিণে গিয়ে। তখন যুদ্ধ চলছিল, মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে তারা আর ওপারে ফিরে যায়নি। তো সেই মথুরগঞ্জ থেকে পুষ্পরানি ও বলাইহরির কিশোরী মেয়েটি কাজ করতে এসেছিল কলকাতা। সুশান্ত আর বহ্নির পুরোন বাড়িতে। বাড়িটি পাঁচ কাঠা জমিতে। পূর্ববঙ্গ থেকে এসে সুশান্তর বাবা কোনো রকমে খাড়া করেছিলেন। সুশান্তর দাদা বহুদিন ইংল্যান্ডে। এদেশে আসেন না। দিদি দিল্লিতে সেটলড। বহ্নিদের বাড়ি ছিল বেহালা। মা-বাবা দুজনের কেউ নেই। দুই ভাই ভাগ করে নিয়েছে বাড়িটি। বহ্নি জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে দেখেছিল তার জন্য কিছু নেই। ভাইরা ভেবেছিল বোন আর ফিরবে না। ঘর থেকে যে মেয়ে বেরিয়ে গেছে, সে ফিরে এলেও গ্রহণ করবে কীভাবে? তারা ভূত দেখেছিল। পরিষ্কার বলেছিল, বহ্নির জন্য তাদের সামাজিক সম্মান গেছে। আর এখন যে জমানা, সেখানে ভুয়ো বিপ্লবীদের কোনো জায়গা নেই। দয়া করে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বামপন্থি সরকার না এলে জেলেই পচে মরত তারা। বহ্নি বাড়ির ভাগ পাবে না। কিছুই পাবে না। তারা সরকারি দলের ঘনিষ্ঠ। বহ্নি কিছুই করতে পারবে না। বহ্নির উচিত ছিল একটা বর জুটিয়ে নেওয়া। পারেনি যখন, তাদেরও দায় নেই। থানায় গিয়ে লাভ নেই। থানা

তাদের মান্য করে, কেননা তারা শাসক দলের অনুগ্রহ পায়। বিপ্লব হয়ে গেছে। চতুর্দিকে শান্তি বিরাজমান। কথা না বলে বহ্নি তখন সুশান্তর কাছে ফেরে। সুশান্ত তাকে বলেছিল, চলে এসো। আমাদের কাজ ফুরোয়নি।

কাজ ফুরোয়নি বলেছিল বটে, কিন্তু কাজটি কী তা দুজনের কেউ ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কাজটি কী তা তখন যেন জানেই না। সব ছিন্নভিন্ন। বিপ্লবের স্বপ্ন ফুরিয়েছে কিংবা চাপা পড়ে গেছে। তারা ম্যারেজ রেজিস্টারকে নোটিস দিয়ে বিবাহযাত্রা করেছিল। বিবাহ না করে এক বাড়িতে বসবাস করে কী করে? পুরোন দুই কমরেড এসেছিল এন্টালি আর খিদিরপুর থেকে। সাক্ষী হয়েছিল সেই ঘটনার। তারা তারপর তারা, সেই দুই কমরেড কোনো দিক খুঁজে না পেয়ে তদানীন্তন শাসক দলের হয়ে কাজ করতে লাগল। এখন আবার দল বদল করেছে। কাউন্সিলর। তাদের সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই।

বিবাহর পর সন্তানের জন্য বসেছিল দুজনেই। একটি শিশুর মুখ দেখবে। তাকে বড় করবে। তখন একটা কাজ হবে। সুশান্ত 'সংক্রান্তি' পত্রিকা আবার বের করার কথা ভাবছিল। অতনু কোথায় কে জানে। অতনুদের বেলগাছিয়ার বাসাবাড়িতে সে খোঁজ নিতে গিয়েছিল। ১৯৮৫ সাল। পায়নি। তাদের পরিবার ভাড়াবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। সুতরাং একা একা 'সংক্রান্তি' বের করার কথা ভেবেছিল সুশান্ত। তখন আয় ছিল না কারোর। টিউশনি আরম্ভ করে দুজনেই। বহ্নিশিখা চাকরির চেষ্টা করতে থাকে। খুব কষ্টে গেছে অনেকদিন। তারপর বহ্নিশিখা পায় প্রাইমারি ইস্কুলের চাকরিটি। কমরেডরা সবাই যে যার মতো করে তখন জীবনে প্রবেশ করেছিল। তারা পারেনি। কাজ ফুরোয়নি। কিন্তু কাজটি কী তা বুঝতে পারছিল না। তাদের বয়স হয়ে গিয়েছিল। সন্তান হয়নি। বাড়িতে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল যেন দুজনে। সেই সময় হাসনাবাদের কমরেড বিশ্বনাথ গায়েন তাদের কাছে নিয়ে এসেছিল লতাকে। সুন্দরবনের অভাবী ঘরের মেয়ে। দশ বছরের মেয়েকে পড়া ছাড়িয়ে কাজে দিতে চায় বাবা-মা। বছর বছর বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে ধান নষ্ট করে। অভাব যায়ই না। মেয়েটা পারবে। দেখ না সুশান্ত, বাসন মাজা রান্না করা–সব জানে। নেবে? মথুরগঞ্জের লতা, বনলতা। গরিব চাষিঘরের মেয়ে, তোমার ঘরে দুটো খেতে পাবে তো।

বাবার নাম বলাইহরি। মেয়ে কবিতা। শীর্ণকায় বলাইহরি কী এক সঙ্কোচে নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে। বসতে বললেও বসছিল না। শ্যাম বর্ণের বালিকাটি অবাক চোখে সুশান্ত আর বহ্নিকে দেখছিল। সুশান্ত আর বহ্নির মনের ভিতরে ঝড় উঠেছে তখন। কমরেড! কবে নাগাদ সুফল ফইলবেক? দোবেলা ভাত হবেক? আপন আপন জমিন হবেক, কমরেড আর কত দিন?

সেই অপ্রস্ফুটিত বনের ফুল, বালিকার গা থেকে গাঙের পানির নোনা গন্ধ ভেসে আসছিল। তিনটে গাঙ পেরিয়ে হাসনাবাদ এসে ট্রেন ধরে দমদম এসে আবার ট্রেন ধরে বেলঘরিয়া। বিশ্বনাথ বলল, সুশান্তদা, এদের আমি চিনি, মরিচঝাঁপি থেকে এসে খুব মার খেয়েও আর ফিরে যায়নি, দম খুব, বলে নাকি মরিচঝাঁপির সময় পুকুরে ডুব দিয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি লুকিয়ে ছিল এর ঠাকুরদা আর বাবা, অন্ধকারে বেরিয়ে এসেছিল পুলিশ চলে যাওয়ার পর, মেয়েটাকে বুঝিয়ে দিয়ো, সব কাজ পারবে।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে সুশান্ত সব ভুলে গিয়েছিল। গাঙে ভাসতে ভাসতে এলো নাকি এই বুনোলতা? চোখদুটি দেখো, চোখের ভিতরে যেন গাঙের ছায়া। ভাসিয়ে রেখেছে জলের ওপর। বসতে বললে সে মেঝেয় বসে তার মসৃণতায় হাত বুলোতে লাগল। এমন পাকা ঘরে সে এই প্রথম। চোখের পলক পড়ছিল না যেন। সুশান্ত কিছুদিন ছিল সুন্দরবনে। সেখানে তার পিছনে ছায়ার মতো থাকত এক লখাই মৃধা। লখাইয়ের সঙ্গে এ দ্বীপ ও দ্বীপ করেছে কম না। সংগঠিত করছিল গরিব মানুষকে। কিন্তু সে কাজ যে কত কঠিন। কারোর সময়ই হয় না। কাজ ফেলে আসে কে? হয় গাঙে গেছে, না হয় খাটতে গেছে, না হয় ভুখে আছে। লখাই জিজ্ঞেস করেছিল, কতদিন লাগবে কমরেট?

লাগবে, তুমি কার বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করেছ তা জানো? সুশান্ত বোঝাতে চেয়েছে।

মহেশখালির বিন্দাবন মন্ডল, জানি। লখাই বলেছিল, তার ঘরে দুইটা বন্দুক আছে কমরেট।

যুদ্ধ শুরু হবে, ন্যায় যুদ্ধ, ভাতের লড়াই। সুশান্ত আর কোনো কথা খুঁজে পায়নি। কথার বড় আকাল। লখাইয়ের জন্য অন্য রকম কথা চাই, বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সেই কথা তার ঝুলিতে নেই। লখাই বলেছিল, যুদ্ধ, আমাদের না আছে পানসি, না আছে নৈকো, গাঙে ডুবায়ে মারবে। তাইই হয়েছিল মরিচঝাঁপি ফেরত মানুষের। সে আরো ক'বছর বাদে। লখাই বলেছিল, মেরে লাশ গাঙে ভাসাই দিলি, মাছেই খেয়ে নেবে, মহেশখালির বিন্দাবন অমন করেছে ক'বার, তার ভিতরে একটা কামিন মেয়ে ছিল।

মহেশখালি কোথায়? তিন দ্বীপ পার হয়ে আর এক কোন দ্বীপ? শুনতে শুনতে সুশান্ত তার কথা বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। আর কতদিন কমরেট? কতদিন তা সে জানত না। এখনো জানে না। মনে হয় এ জীবনে আর নয়। পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। হ্যাঁ, আর কতদিন! ক্ষুধা যে সর্বগ্রাসী। কতদিন খালি পেটে বসে থাকা যায়! সব মনে পড়ে যায়!

চেলিয়ামার কুরচি দাস, পারার নন্দিন মাহাতো, জয়চণ্ডী পাহাড়ের কোলের চিন্তামণি, অহল্যারা ফিরে এল বহ্নিশিখার মনে। তাকে পুলিশ তুলেছিল জামদা থেকে। মানবাজার জামদার এক খোঁচড় খবর দিয়েছিল। সে-ও পার্টির ছিল। কিন্তু লোভ তাকে খেয়েছিল। সে ছিল অভাবের দিন। না খেয়ে থাকা অভ্যেস করছিল বহ্নি। কিন্তু সে অভ্যাস তো নতুন। ক্ষুধার চেয়ে বড় কিছু নেই। সে চেষ্টা করে যাচ্ছিল অভ্যাস বজায় রাখতে। কিন্তু তারা হতে দেবে না। দিদির জন্য ভাত জুটিয়ে আনত কুরচি, অহল্যা, বেহুলারা, আহা! কতদিন বাদে তাদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার? তারা জেল থেকে বেরিয়ে কোথায় গেছে? বেঁচে আছে তো নন্দিন মাহাতো? রক্তকরবীর নন্দিন নাম দিয়েছিল সে। কী বুদ্ধি ছিল মেয়েটার। আসল নাম ছিল পার্বতী। তার একটা বোন ছিল, লক্ষ্মী মাহাতো। এমন বয়স। সে এলো নাকি?

আয় আয়, আয় বস, মাটিতে কেন, ওই চেয়ারে বস, সবাই বসুন, কী নাম তোর মেয়ে?

লতা, বনলতা, তুমার নাম, ও মা? সে আলটপকা জিজ্ঞেস করেই মুখ নামিয়েছিল।

মা...। বহ্নি চুপ করে তাকিয়েছিল মেয়ের দিকে। এইটুকু মেয়ে, কী কাজ করবে? একে দিয়ে কাজ করাতে পারবে তারা? বাসন মাজবে, ঘর মুছবে, আর তারা পায়ের উপর পা রেখে চায়ে চুমুক দেবে? বিপ্লব হয়নি, তাই এমন হতেই পারে। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে, তাই এমন হতে পারে।

সুশান্ত বলল, এইটুকু মেয়ে, এ কেমন করে কাজ করবে?

বিশ্বনাথ গায়েন বলল, ওদের অভ্যেস আছে সুশান্ত, ভুলে গেছ সব।

ভোলেনি সুশান্ত, ভোলেনি বহ্নিশিখা। মেয়ে, সেই যে প্রায় পঁয়তিরিশ বছর আগে থেকে মেয়েটি তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। বনলতা। কত বছর আগে তারা ঘর ছেড়েছিল। আবার ফিরেও এসেছিল তাদের ছেড়ে যাদের কাছে গিয়েছিল। বনলতা এসেছে সেই ভারতবর্ষ থেকে। বহ্নিশিখা ডাকল, আয় এদিকে, দেখি তোকে ভালো করে। (মনে মনে বলল বহ্নিশিখা, মা বলে আর একবার ডাক দেখি।)

মেয়ে হাসল। কতদূর অন্ধকার থেকে আলোর শীর্ণরেখা ভেসে এলো যে, তা দুজনের কেউই ঠাহর করতে পারে না।

## দুই.

আমি অতনু। সুশান্ত আমার কলেজের বন্ধু। কেমিস্ট্রি অনার্স। আমাদের কলেজ ছিল স্কটিশ চার্চ। হেদুয়ার পিছনে। কী শান্ত তার পরিবেশ। সাহিত্য, নাটক, গান–নানা চর্চা নিয়ে আমাদের কলেজ ছিল বিখ্যাত। কেয়া চক্রবর্তী ইংরিজি পড়াতেন। বোটানিতে পড়ত একটি মেয়ে, সে তখন অরুন্ধতী দেবীর ছবিতে অভিনয় করে বিখ্যাত। আমাদেরই বয়সী। কী অদ্ভুত লাগত, রোমি চৌধুরী আমাদের কলেজের ছাত্রী! মিঠুন চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ মনে হয় বোটানি অনার্স পড়ত। পরে তার ভারতজোড়া নাম হয়েছিল। মৃগয়া সিনেমা দেখতে দেখতে মনে পড়েছিল আমাদের স্কটিশের সহপাঠী। আমাদের সময় ছিল ১৯৬৮-৭২। তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চার বছরের হয়ে গিয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলন, বিদ্রোহ, পাল্টা যুব শক্তির আবির্ভাব পরীক্ষা পিছিয়েই দিচ্ছিল ক্রমাগত। আমি আর সুশান্ত একটা দু-ফরমার পত্রিকা বের করেছিলাম, তাতে গল্প লিখেছিলাম আমি,

সুশান্ত কবিতা। প্রবন্ধ ছেপেছিলাম বাংলার বিখ্যাত এক অধ্যাপকের। কিন্তু আমরা দুজনেই কেউ সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম না। ক্লাসের বন্ধুরা হেসেছিল। কেউ কেউ বলেছিল, বাংলা অনার্সে গিয়ে ভর্তি হতে। হ্যাঁ, সুশান্ত আমার সমুখেই বদলে যাচ্ছিল। মুখচোখ কঠিন হয়ে যাচ্ছিল ওর। আমি বুঝতে পারছিলাম সুশান্ত বিপ্লবী পার্টিতে ঢুকে পড়েছে। নক্সালবাড়িতে গুলিতে কৃষক হত্যার পর কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী অংশ বেরিয়ে এসেছে বছর দুই আগে। সেই কথাই ছিল সুশান্তর কথা। সে বদলে যাচ্ছে। বলছিল, এই সিস্টেম ভাঙতেই হবে, এই শিক্ষার কোনো মূল্য নেই, মানুষের মুক্তির জন্য গ্রামে যেতে হবে অতনু, তুই গ্রাম দেখেছিস, সাঁওতাল পরগণা? আদিবাসী গ্রামে যাবি আমার সঙ্গে? পিকিং রেডিয়ো বলেছে ভারতে শোনা গিয়েছে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ। বিপ্লবের গান। চারুবাবু। কানু সান্যাল, খোকন মজুমদার, চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। আর সেই গান, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর...

জন হেনরি জন হেনরি
নাম তার ছিল জন হেনরি
ছিল যে জীবন্ত ইঞ্জিন
হাতুড়ির তালে তালে গান গেয়ে
শিল্পী খুশি মনে কাজ করে রাতদিন
কালো পাথরে খোদাই জন হেনরি।

সুশান্ত ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল বিপ্লবের ডাক শুনে, অতনুর মনে আছে তা। ফিরেছিল নিঃস্ব হয়ে। কাজ ফুরোয়নি বলে বহ্নিশিখাকে ডেকেছিল বটে সুশান্ত, কিন্তু ফুরিয়েছিলই তো। কী আর কাজ পড়ে থাকে পরাজিত মানুষের জন্য? পার্টি নেই। থাকলেও টুকরো টুকরো, সবাই এক একটি দল। তাদের কাজ পরস্পরে পরস্পরকে দোষারোপ করা। রাজ্যে যে শাসন চলছে তা নিয়ে সবাই খুশি। অপারেশন বর্গা করে গ্রাম শান্ত করা গেছে। বড় বড় চাষিরা কৌশলে দল বদল করে নিয়েছে পরে। নিজেদের জমির বর্গাদারকে চুপ করিয়ে রাখতে পেরেছিল ধর্মের ভয় দেখিয়ে। বাবুর জমিতে বর্গা করা অধর্ম তো নিশ্চয়। তখন বুদ্ধিমান পঞ্চায়েত ছোট ছোট জোতের চাষির জমিতে কৌশলে বসিয়ে দিচ্ছে বর্গাদারের নাম। কিন্তু সব তাও নয়। বড় জোতের মালিক তো প্রথমে ভয় পেয়েছিল সত্য। সমঝোতা করতে সময় লেগেছিল। তখন যেন চারদিকে শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে। মৃদু মন্দ মলয় বাতাস। সুশান্ত আর বহ্নির কিছু করার ছিল না। বেশ কয়েক বছর বসে থেকে, টিউশনি করে বেঁচে থেকে শেষমেশ সুশান্ত একটি পাবলিকেশন করে। পত্রিকা করে। সেই পত্রিকা যেটি সে প্রথম জীবনে প্রকাশ করেছিল অতনুর সঙ্গে। অতনু জানত না, তাদের সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া পত্রিকা 'সংক্রান্তি' আবার বের করছে সুশান্ত। সম্পাদক বহ্নিশিখা রায়। প্রকাশক সুশান্ত রায়। পরে যুক্ত হয়, কর্মসচিব বহ্নিলতা মৃধা। ঠিকানাঃ...।

অতনুর জানার উপায় ছিল না। সে কবেই লেখা ছেড়ে দিয়ে মন দিয়ে সংসার করেছে। দুই সন্তান। মেয়েকে বড় করেছে। বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে কর্পোরেট পাত্র সংগ্রহ করে। ছেলে দিল্লিতে সেটলড। এখন স্বামী স্ত্রীর কিছু করার নেই। দুজনেই রিটায়ার করেছে সদ্য। বছরে তিনবার বাইরে যায়। কখনো পুরুলিয়ার অযোদ্ধা পাহাড়। কখনো রাজস্থানের মরু অঞ্চল। কখনো যায় দিল্লি হয়ে মুসৌরী দেহরাদুন। দিল্লিতে ছেলে আর ছেলের বউ, নাতনি। এই ভাবে কেটে যাবে জীবন। এ জীবন যে স্বপ্ন নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল তা আরম্ভেই বিনষ্ট হয়েছিল। 'সংক্রান্তি' বন্ধ। লেখা কেউ ছাপে না। আগ্রহ চলে যায় ক্রমশ। রিটায়ার করে একবার চেষ্টা করেছিল। সফল হয়নি তা। কে যেন বলেছিল সে গাড়ি বহুদূর চলে গেছে। তবুও অতনু তৃপ্ত। জীবনের বড় দুই কাজ, দুই সন্তানকে বড় করে প্রতিষ্ঠা দেওয়া, তা হয়েছে। বড় ফ্ল্যাট হয়েছে। খুব শীগগির যাবে ইউএসএ। দেখে আসবে অতুল বৈভবের দেশ। নায়াগ্রার গর্জন শুনে আসবে। গ্রান্ড ক্যানিয়ন, হলিউড–মেয়ে মুনাই– অদ্রিজা গল্প করে ভিডিয়ো আলাপের সময়। তারা শনিবার বেরিয়ে পড়ে লং ড্রাইভে। স্বপ্নের মতো কথা সব।

হ্যাঁ, সুশান্তর কথা হোক। আমি অতনু বলছি সুশান্তর কথা। আত্মগোপন করা সুশান্ত হঠাৎ একদিন আমার বাড়ি এসেছিল দুপুরে, ছুটির দিনে। তার আগে সে কলেজে আসা ছেড়েছিল। কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি ভেঙেছিল। কেমিস্ট্রির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এ, বি,– অপরেশ ভট্টাচার্য স্যার বলেছিলেন, তোমাদের বন্ধু, সুশান্ত দত্ত, এই কাজ করল কেন, জীবনটা নষ্ট করবে?

অপরেশ ভট্টাচার্য স্যারের কথা মনে পড়ে সুশান্তর। মোটা গোফ, ধুতি পাঞ্জাবি। ভালোবাসতেন ছাত্রদের নিজের সন্তানের মতো। কে না খেয়ে নটার ক্লাস করতে এসেছে উত্তরপাড়া থেকে, তাকে মানিকতলায় নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভাত খাইয়ে এনেছেন। তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। চোখ ছলছল করছিল প্রবীণ মানুষটির।

আমার সঙ্গে দেখা হয়নি অনেকদিন স্যার। অতনু বলেছিল।

ও ফার্স্ট ক্লাস পেতই, ল্যাবরেটরিটা কত দিন ধরে সাজিয়েছিলাম আমি, ধ্বংস করে দিল! কণ্ঠস্বর বুঁজে গিয়েছিল স্যারের।

অপরেশবাবু আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই ভাবে বিপ্লব হতে পারে কি না, আমি কি সমর্থন করি বিপ্লবীদের এই কাজ?

চুপ করে ছিলাম। কী বলব? বিপ্লব মানে কি ল্যাবরেটরি ধ্বংস? আমরা শিখব না রসায়নের ম্যাজিক?

সুশান্তর সঙ্গে যদি দেখা হয় জিজ্ঞেস করো। অপরেশবাবু বলেছিলেন।

ইয়েস স্যার।

ওকে সাবধান হতে বলো, পুলিশ কতবার জেরা করেছে আমাকে, জিজ্ঞেস করেছে, আমি বলতে পারিনি ওর নাম, ও ভুল করেছে, জীবন কিন্তু সহজ নয়, বিপ্লব এইভাবে হয় কি না আমি জানি না, অনুতাপ করতে হবে একদিন। অপরেশবাবুর চোখ আর্দ্র হয়ে এসেছিল।

সুশান্ত আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ত্রিকোণ পার্কটিতে। বাতাস তখন গরম হচ্ছে। শীত চলে গিয়ে বসন্ত তার উজ্জ্বল মুখ দেখিয়েছে। রোদের ভিতরে গ্রীষ্মকাল, ছায়ায় শীত। সুশান্ত বলেছিল, গ্রামে চলে যাচ্ছে সে। গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরবে। মুক্তির স্বপ্নে তার দুচোখ ভেসেছে তখন অকুল দরিয়ায়। সুশান্ত বলেছিল, যদি বিপ্লব হয়, মুক্তি হয়, আমি ফিরে আসব, দেখা হবে অতনু, তুই শহরে থেকে কী লিখবি, গ্রাম ভারত না চিনলে কী ভাবে লিখবি?

সুশান্ত আর অতনু যে ম্যাগাজিন বের করত 'সংক্রান্তি', সেই ম্যাগাজিনে অতনু বসুর লেখা বের হয় প্রথম। সুশান্ত সত্যিই চলে যাচ্ছিল শহর ছেড়ে। অতনুর খুব মনে পড়ে সেই মার্চের দুপুরের কথা। তিন কোনা পার্কটিতে একটি কদম গাছের ছায়ায় বসেছিল দুজন। অতনু বলেছিল, অপরেশ স্যারের কথা। •

*চলবে...*

## অমর মিত্র

অমর মিত্র (জন্ম : ৩০ আগস্ট, ১৯৫১) একজন ভারতীয় বাঙালি লেখক। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। কর্মজীবন কাটে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের এক দপ্তরে। তিনি ২০০৬ সালে ধ্রুবপুত্র উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। অশ্বচরিত উপন্যাসের জন্য ২০০১ সালে বঙ্কিম পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে। এ ব্যতীত ২০০৪ সালে শরৎ পুরস্কার (ভাগলপুর), ১৯৯৮ সালে সর্ব ভারতীয় কথা পুরস্কার স্বদেশযাত্রা গল্পের জন্য। ২০১০ সালে গজেন্দ্রকুমার মিত্র পুরস্কার পান। ২০১৭ সালে সমস্ত জীবনের সাহিত্য রচনার জন্য যুগশঙ্খ পুরস্কার, ২০১৮ সালে কলকাতার শরৎ সমিতি প্রদত্ত রৌপ্য পদক এবং গতি পত্রিকার সম্মাননা পেয়েছেন। খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাট্যকার মনোজ মিত্র তার অগ্রজ।

Tamilnadu Map

## একনজরে তামিলনাড়ু

| | |
|---|---|
| দেশ | ভারত |
| অঞ্চল | দক্ষিণ ভারত |
| রাজধানী | চেন্নাই (পূর্বতন মাদ্রাজ) |
| জেলা | ৩৮টি (বিভাগ ৫টি) |
| প্রতিষ্ঠা | ১ নভেম্বর ১৯৭৫ |
| সরকার | |
| • রাজ্যপাল | রবীন্দ্র নারায়ণ রবি |
| • মুখ্যমন্ত্রী | এম.কে. স্ট্যালিন |
| • সংসদীয় আসন | রাজ্যসভা ১৮ ॥ লোকসভা ৩৯ |
| • হাইকোর্ট | মাদ্রাজ হাইকোর্ট |
| আয়তন | |
| • মোট | ১৩০,০৫৮বর্গকিমি (৫০,২১৬ বর্গমাইল) |
| • এলাকা ক্রম | ১০তম |
| জনসংখ্যা (২০১১) | |
| • মোট | ৭২,১৪৭,০৩০ |
| • ক্রম | ৬তম |
| • ঘনত্ব | ৫৫০ কি.মি (১,৪০০ বর্গমাইল) |
| • সাক্ষরতা | ৭৩.৯% |
| সময় অঞ্চল | ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০) |
| আইএসও | ৩১৬৬ কোড IN-TN |
| সরকারি ভাষা | তামিল, ইংরেজি |
| ওয়েবসাইট | www.tn.gov.in |

রবীন্দ্র নারায়ণ রবি
রাজ্যপাল

এম. কে. স্ট্যালিন
মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রবিন্দু

# তামিলনাড়ু

## মিজান স্বপন

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে অন্যতম তামিলনাড়ু। ভারতীয় উপদ্বীপের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত এই রাজ্যের সীমানায় রয়েছে পুদুচেরি, কেরল, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ। তামিলনাড়ুর ভৌগোলিক উত্তর সীমায় পূর্বঘাট, পশ্চিম সীমায় নীলগিরি, আন্নামালাই পর্বত ও পালাক্কাদ, পূর্ব সীমায় বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ পূর্ব সীমায় মান্নার উপসাগর ও পক প্রণালী এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর অবস্থিত। ১৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯-এ মুখ্যমন্ত্রী আন্নার সভাপতিত্বে, মাদ্রাস রাজ্যকে সরকারিভাবে নাম বদলে তামিলনাড়ু রাজ্য করা হয়। এর আগে তিনি ১৮ জুলাই ১৯৬৭ সালে মাদ্রাস রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে ইংরেজি ও তামিল ভাষায় তামিলনাড়ু রাখার একটি সংকল্প প্রস্তুত করেন

## ইতিহাস

প্রায় ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে তামিলনাড়ু ভূখণ্ড তামিল জাতির আবাসস্থল। বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে অন্যতম তামিলনাড়ু। রাজ্যটি মূলত তামিলহাম নামে পরিচিত ছিল এবং কারিপাট্টিনাম, আরিকামেডু এবং কোরকাইয়ের মতো প্রাচীন বন্দরগুলোই তামিলহাম বসতিগুলোর প্রমাণ। চোল রাজবংশ প্রথম থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর এবং তিরুচিরাপল্লী জেলা শাসন করেছিল। অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছিল এই সময়ে এবং চোলদের সামরিক শক্তির কারণে রাজ্যটি শক্তিশালী হয়েছিল। পল্লবরা চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল এবং প্রায় এক বছর রাজত্ব করেছিল। তারপর পাণ্ডরা চৌদ্দ শতকে তাদের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে যা সংক্ষিপ্ত ছিল কারণ আলাউদ্দিন খিলজি মাদুরাই লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় যার ফলে বাহমানি রাজ্য পুনর্বাসন করে। ব্রিটিশরা ডাচ এবং ফরাসিদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় এসে দক্ষিণ ভারতকে মাদ্রাস প্রেসিডেন্সিতে একীভূত করে। তারপর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় যা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার দিকে পরিচালিত করে। মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি মাদ্রাস রাজ্যে পরিণত হয়, যার মধ্যে বর্তমান তামিলনাড়ু, উপকূলীয় অন্ধ্র প্রদেশ, উত্তর কেরালা এবং কর্ণাটকের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ছিল স্বাধীনতা-পরবর্তী।

## জনসংখ্যা

২০১১ খ্রিস্টাব্দের জনমিতি অনুসারে তামিলনাড়ু রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ছিলো ৭, ২১, ৪৭, ০৩৯ জন, যার মধ্যে ৩, ৬১,৩৭, ৯৭৫ জন পুরুষ ও ৩, ৬০, ০৯, ০৫৫ জন নারী। জনসংখ্যার বিচারে এটি ভারতের সপ্তম জনবহুল রাজ্য তথা দেশের জনসংখ্যার ৫.৯৬ শতাংশ বাস করেন এই রাজ্যে। রাজ্যের মোট সাক্ষরতার হার ৮০.০৯ শতাংশ, যারমধ্যে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৮৬.৭৭ শতাংশ ও নারী সাক্ষরতার হার ৭৩.৪৪ শতাংশ। শিশু সংখ্যা ৭৪, ২৩, ৮৩২, যারমধ্যে শিশুপুত্র ৩৮, ২০, ২৭৬ জন ও শিশুকন্যা ৩৬, ০৩, ৫৫৬ জন। মোট জনসংখ্যার ১০,৫১ শতাংশ ছয়বছর অনূর্ধ্ব শিশু। রাজ্যের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনঘনত্ব ৫৫৫ জন।

## ভাষা ও সাহিত্য

গোটা ভারতের ছয় কোটির বেশি লোক তামিল ভাষায় কথা বলে। এটি ভারতের তামিলনাড়ু অঙ্গরাজ্যের সরকারি ভাষা এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব শ্রীলঙ্কার প্রধান ভাষা। ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতে বহু তামিলভাষী লোককে শ্রমিক হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়। সে সব অঞ্চলগুলোতে তারা তামিলভাষী সম্প্রদায় গঠন করে। এদের মধ্যে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, মরিশাস ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বেশ বড় আকারের তামিলভাষী সম্প্রদায় রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে প্রায় সাড়ে সাত কোটির মতো লোক তামিল ভাষায় কথা বলে।

এ ভাষার ধ্বনিব্যবস্থা এবং ব্যাকরণের সাথে প্রত্ন-দ্রাবিড় ভাষার অনেক মিল আছে।

তামিলদের ভাষা নিয়েও রক্তক্ষয়ী প্রতিবাদ করতে হয়। ১৯৫৮ সালে নেহরু মাদ্রাস সফরে গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি তামিলভাষীদের ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে তির্যক মন্তব্য 'ননসেন্স' বলায় একটি রক্তক্ষয়ী প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ দিন মাদুরায় সংঘটিত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রায় ৩০০ মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়। নেহরু পরে দক্ষিণ ভারতের মানুষের অনুভূতি বুঝতে পারে এবং পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে ভাষা বিষয়ে সংবিধানে বর্ণিত ধারায় পরিবর্তন আনেন। কিন্তু তামিল ছাত্ররা তারপরও আন্দোলন অব্যাহত রাখেন কারণ সংশোধনী সম্পর্কে তারা সন্দিহান ছিলো। এবং তা এক সময় দাঙ্গায় রূপ নেয়। আন্দোলনে দাঙ্গার বিজয় হয়। এরপর তামিলনাড়ু থেকে কংগ্রেস চিরতরে বিদায় হয়। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে ডিএমকে ক্ষমতায় আসে। ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম ২০০৪ সালে ভারতীয় সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ইতিহাসে প্রথম তামিলকে ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

## তামিলনাড়ুর সংস্কৃতি

তামিলনাড়ুর আদিবাসীদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার সখ্যতার সাথে। রাজ্যটিতে অনেক হিন্দু রাজবংশের বসবাস ছিল। আর এ জন্যই আজও দক্ষিণে হিন্দু ধর্মের একটি শক্ত ঘাঁটি রয়েছে। এখানে মোট জনসংখ্যার ৮৮% এরও বেশি হিন্দু এবং বাকিরা খ্রিস্টান ও মুসলামান। সমৃদ্ধ মন্দির সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত তামিলনাড়ু। এখানে অগণিত মন্দির রয়েছে যা রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের উদাহরণ।

এখানকার মানুষেরা আধ্যাত্মিক এবং যুগ যুগের পুরানো আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করে। প্রযুক্তির হাব হিসেবেও পরিচিত, তামিলনাড়ু ভারতে শীর্ষস্থানীয় সাক্ষরতার হারের মধ্যে রয়েছে। তামিলনাড়ুর লোকেরা সঙ্গীত, নৃত্য এবং শিল্প সাহিত্যের দিকে ঝুঁকছে। জাতীয় ঐতিহ্যে তামিলনাড়ুর অবদান ব্যতিক্রমই বলা যায়। তামিল সাহিত্যকে ভারত সরকার একটি শাস্ত্রীয় ভাষা হিসেবে বিবেচনা করে। কর্ণাটক সঙ্গীত এবং ভারতনাট্যম শতাব্দী ধরে বিকাশ লাভ করেছে এবং এগুলো ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির চিত্র।

তামিল সঙ্গীতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক কর্ণাটক সঙ্গীত। এ সঙ্গীত সাধারণত গায়ক, একটি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গী (সাধারণত একটি বেহালা), একটি তাল যন্ত্র (সাধারণত একটি মৃদঙ্গম) এবং একটি খঞ্জনীর সমন্বয়ে সঙ্গীতশিল্পীদের একটি ছোট দল দ্বারা পরিবেশিত হয়। পারফরম্যান্সে ব্যবহৃত অন্যান্য সাধারণ যন্ত্রগুলোর মধ্যে ঘটাম, কাঞ্জিরা, মরসিং, বেণু বাঁশি, বীণা এবং চিত্রবীণা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সঙ্গম সাহিত্যের অনেক কবিতা, প্রাথমিক সাধারণ যুগের ধ্রুপদী তামিল সাহিত্য,

সঙ্গীতে রচিত হয়েছিল। এই প্রাচীন সঙ্গীতে ঐতিহ্যের বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, যা প্রাচীন সঙ্গম বই যেমন ইথোকাই এবং পাট্টপট্টুতে পাওয়া যায়। সবচেয়ে অসামান্য পারফরম্যান্স, এবং কর্ণাটিক সঙ্গীতশিল্পীদের সবচেয়ে বেশি ঘনত্ব চেন্নাই শহরে পাওয়া যায়। মাদ্রাস মিউজিক সিজনকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের একটি প্রধান রূপ হলো ভরতনাট্যম যা তামিলনাড়ুতে উদ্ভূত হয়েছিল। ঐতিহ্যগতভাবে, ভরতনাট্যম ছিল একটি একক নৃত্য যা কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিবেশিত হতো। এটি হিন্দু ধর্মীয় থিম এবং আধ্যাত্মিক ধারণা প্রকাশ করে। বিশেষ করে শৈব ধর্মের, বৈষ্ণব ও শাক্তধর্মেরও। ভরতনাট্যম ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্রীয় নৃত্য ঐতিহ্য হতে পারে। ভারতী মুনি, নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীন সংস্কৃত পাঠে ভরতনাট্যমের তাত্ত্বিক ভিত্তি পাওয়া যায়, খ্রিস্টীয় ২য় শতকের মধ্যে এর অস্তিত্ব প্রাচীন তামিল মহাকাব্য শিলপাদিকারমে পাওয়া যায়।

তামিল স্থাপত্যে দুটি শৈলী রয়েছে। একটি হলো রককাটা শৈলী আরেকটি চোল স্টাইল। সারা বিশ্বের অন্য যেকোনো ধরনের রক-কাট আর্কিটেকচারের চেয়ে ভারতীয় রক-কাট আর্কিটেকচার বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। রক-কাট আর্কিটেকচার হলো একটি কঠিন প্রাকৃতিক শিলা থেকে খোদাই করে একটি কাঠামো তৈরি করার অনুশীলন। এখানে এ শিলা-কাটা স্থাপত্য বেশিরভাগই ধর্মীয় প্রকৃতির। পল্লবরা ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের অগ্রদূত। পল্লব স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হলো মহাবালিপুরমের শিলা-কাটা মন্দির।

চোল রাজারা গঙ্গাইকোন্ডা চোলাপুরমের বৃহদিশ্বর মন্দির এবং থাঞ্জাভুরের বৃহদিশ্বর মন্দির, দারাসুরামের আইরাবতেশ্বর মন্দির এবং সরবেশ্বর (শিব) মন্দিরের মতো মন্দির তৈরি করেছিলেন। থাঞ্জাভুরের মহৎ শিব মন্দিরটি সমগ্র রাজরাজা সময়ের কৃতিত্বের একটি স্মারক। এটি ১০০৯ সালের দিকে নির্মিত।

## পোঙ্গল উৎসব

ভারতের তামিল জাতিগোষ্ঠী নতুন ফসল কাটার পর হাজার বছরের পুরোনো এই উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। এ উৎসব এখানকার মানুষের পরম্পরাগত এবং এটি একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব। পোঙ্গল এর বাংলা অর্থ বিপ্লব। এটি একটি লোকজ উৎসব। প্রতিবছর ১৪-১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এ উৎসব পালন করা হয়।

## জলবায়ু

তামিলনাড়ুর জলবায়ু প্রধানত উষ্ণ। রাজ্যটিকে সাতটি কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে : উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম, দক্ষিণ, উচ্চ বৃষ্টিপাত, উচ্চ উচ্চতা পাহাড় এবং কাবেরী ডেল্টা (সবচেয়ে উর্বর কৃষি অঞ্চল)। মে-জুন মাসে চেন্নাইয়ে গড় তাপমাত্রা প্রায় ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সাধারণত ২১-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এর মধ্যে থাকে।

পার্বত্য অঞ্চল অর্থাৎ রাজ্যের সর্ব পশ্চিমাংশে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত নিচু দক্ষিণাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কম বৃষ্টিপাত হয়। এই রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৬৩০-১৯০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়।

## শিক্ষা

তামিলনাড়ুতে রয়েছে বহু সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়। এছাড়া আছে অসংখ্য বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলাবিভাগ সমন্বিত কলেজ, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। ফলে বলা যায় তামিলনাড়ুতে শিক্ষালাভের ব্যাপক সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

তামিলনাড়ুর উল্লেখযোগ্য উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হলো–
মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)
গান্ধী গ্রাম রুরাল ইউনিভার্সিটি (১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)
ভারত হিন্দি প্রচার সভা (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
মাদুরাইয়ে মাদুরাই কামরাজ ইউনিভার্সিটি (১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ)।
চিদাম্বরমে আনড়বামালাই বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ)
তামিল ইউনিভার্সিটি (১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ)
তামিলনাড়ু ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি (১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ)

## ধর্ম

সনাতন ধর্ম হলো তামিলনাড়ুর প্রধান ধর্ম। হিন্দুত্ববাদ এদের সংস্কৃতিতে গভীরভাবে জড়িত।
চিদাম্বরম, কাঞ্চিপুরম, থাঞ্জাবুর, মাদুরাই ও শ্রীরঙ্গম তীর্থস্থানের মন্দিরের দ্বারস্তম্ভ বা গোপুরামগুলো খুবই দর্শনীয়। এছাড়াও তামিলনাড়ুতে বিভিন্ন মঠ ও মিশন রয়েছে। যার মধ্যেকুম্ভকোনমে শংকর মঠ এবং শ্রীরঙ্গমে বৈষ্ণব মঠ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

## খাবারদাবার

এখানকার লোকজন সাধারণত মশলাযুক্ত খাবার বেশি পছন্দ করে থাকে। তাদের বেশিরভাগ খাবারই শাক সবজি দিয়ে তৈরি। তামিলনাড়ুর সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার ইডলি। চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি একধরনের পিঠা এটি। এই পিঠা অনেকটা ভাপা পিঠার মতো। আরও একটি জনপ্রিয় খাবার হলো সাম্বার। ইডলি খুব একটা স্বাদযুক্ত না হওয়ায় ইডলির সংগে সাম্বার (ডাল), চাটনি অথবা মাছের তরকারি পরিবেশন করা হয়।

রাজ্যের আরও কিছু জনপ্রিয় খাবার হলো দোসা, মেদু ভাদা, চিকেন চেটিনাদ এবং রসম। এই খাবারগুলি তামিলনাড়ুর খাঁটি এবং সুগন্ধযুক্ত স্বাদকে চিত্রিত করে

## পর্যটন

ভারতের তামিলনাড়ুর ঐতিহাসিক মূল্য পর্যটকদের কাছে গুরুত্ব বহন করে। এখানে এগারো শতকের শেষের দিকের বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তামিলনাড়ুর ঐতিহাসিক স্থান ইতিহাসপ্রেমীদের জন্য উপযুক্ত পর্যটন স্থান। এখানকার অধিকাংশ স্থাপনা চোল এবং পল্লব রাজবংশ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এখানে রয়েছে বিজ্ঞানের বস্তু, শিল্পকর্ম, ব্রোঞ্জের ছাঁচ এবং সেইসাথে চিত্রকর্মের ভান্ডার। তামিলনাড়ুর এই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই দুই হাজার বছরেরও বেশি পুরনো। তামিলনাড়ুর ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিস্তম্ভগুলো বৌদ্ধ মঠ থেকে শুরু করে মসজিদ এবং গীর্জা পর্যন্ত প্রতিটি ধর্মের সেবা করে। স্মৃতিস্তম্ভ এবং ঐতিহাসিক কাঠামোর মধ্যে রয়েছে দুর্গ, প্রাসাদ এবং মন্দির।

এছাড়াও তামিলনাড়ু, দক্ষিণ ভারতের, নীলগিরি পাহাড় এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যে অবস্থিত। এখানে আশ্চর্যজনক সমুদ্র সৈকত শহর এবং হিল স্টেশন পর্যটকদের বিমোহিত করে। হিন্দু এবং খ্রিস্টানদের জন্যও রাজ্যটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান।

## কন্যাকুমারী

তামিলনাড়ু রাজ্যের কন্যাকুমারী একটি জেলাশহর। অপরূপ সৌন্দর্যে আবৃত কন্যাকুমারীর পূর্ব নাম ছিল 'কেপ কোমোরিন'। বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র এবং এখানকার মানুষের বিনয়ী অতিথি আপ্যায়নে কন্যাকুমারী হয়ে উঠেছে অনবদ্য। হিন্দু দেবী কন্যাকুমারীর (যাঁর স্থানীয় নামকুমারী আম্মান) নামানুসারে কন্যাকুমারী নামটি এসেছে।

মহাবলিপুরম : মহাবলিপুরম তার পুরনো সংস্কৃতি ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত। পল্লব সাম্রাজ্যের সময়ে রাজ্যের দুটি বড় বন্দর শহরের মধ্যে একটি ছিল মহাবলীপুরম। খ্রিষ্টীয় সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত হিন্দু মন্দির 'মহাবলীপুরম স্মারকের' জন্য এটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। মহাবলিপুরম মামল্লাপুরম নামে পরিচিত। শহরটি ছোট হওয়ায় এখানে পর্যটকরা ভাড়া করা বাইক সাইকেলে অথবা হেঁটেই পরিদর্শন করতে পারেন।

## কোডাইকানাল

কোডাইকানাল হলো ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্যতম হিল স্টেশন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০০০ মিটার উপর থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বিস্ময়কর জলপ্রপাতসহ তামিলনাড়ুতে দেখার জন্য একটি আদর্শ জায়গা হলো এই হিল স্টেশনটি। কোডাইকানাল, তামিলনাড়ুর অন্যতম খ্যাতিমান পর্যটন স্থান, কোডাইকানাল লেক, ভাট্টকানাল জলপ্রপাত, বিয়ার শোলা জলপ্রপাত, কোকার্স ওয়াক, ব্রায়ান্ট পার্ক, কুরিঞ্জি আন্দাভার মন্দির এবং আরও অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে। কোডাইকানালের কোকার্স ওয়াক এর মনোমুগ্ধকর সূর্যাস্ত এবং সবুজ পাহাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্যের জন্য পরিচিত।

## মাদুরাই

মাদুরাই তামিলনাড়ুর তৃতীয় বৃহত্তম শহর এবং সবচেয়ে প্রাচীন জনবহুল শহর হিসেবে পরিচিত। এখানে বেশ কিছু দর্শনীয় জাঁকজমকপূর্ণ মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। যা এখানকার আধ্যাত্মিকতাকে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরে।

## উটি

তামিলনাড়ুর এরও একটি পর্যটন স্থান উটি। এ স্থানটি মনোমুগ্ধকর সবুজ পাহাড় এবং সুন্দর ফুলের বাগানের জন্য বিখ্যাত। সবুজ পাহাড় এবং প্রচুর জলপ্রপাত পর্যটকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে এবং তাদের কংক্রিট ঘেরা জীবন যাপন থেকে পালানোর প্রস্তাব দেয়। উটির জনপ্রিয় তামিলনাড়ু পর্যটন স্থানগুলি হল বোটানিক্যাল গার্ডেন, মুরুগান মন্দির, এলক হিল, গোলাপ বাগান, পাইন বন, সেন্ট স্টিফেন চার্চ, দ্য টি ফ্যাক্টরি এবং দ্য টি মিউজিয়াম, ডোডাবেটা পিক ইত্যাদি।

## কাঞ্চীপুরম

চেন্নাই থেকে প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে অবস্থিত এই শহর। এটি একসময় পল্লব রাজবংশের রাজধানী ছিল। কাঞ্চীপুরম তার স্বতন্ত্র সিল্কের শাড়ির জন্য বিখ্যাত। 'হাজার হাজার মন্দিরের শহর' হিসেবে পরিচিত এ শহর। এখন এখানে মাত্র ১০০টি মন্দির রয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলো সেই পৌরাণিক স্থাপত্য সৌন্দর্য বহন করে চলেছে।

## অর্থনীতি

তামিলনাড়ু রাজ্যটি ভারতের উন্নয়ন প্রচেষ্টার এক অন্যতম চালিকাশক্তি। এটি শিল্পোন্নত রাজ্য হিসেবে সুপরিচিত। গোটা ভারতের অর্থনীতিতে তামিলনাড়ুর অর্থনৈতিক অবদান উল্লেখযোগ্য। দেশের প্রায় ৭৪ হাজার কোটি রুপি আয়কর আদায় হয় তামিলনাড়ু থেকে। এ রাজ্যের মাথাপিছু আয় ২ লাখ ৪১ হাজার ১৩১ টাকা। এখানে রয়েছে ভারতের সর্ববৃহৎ মোটরগাড়ি শিল্পঅঞ্চল। পোল্ট্রিজাত দ্রব্য উৎপাদনে এই রাজ্য ভারতে শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছে। তুলা উৎপাদন এবং রপ্তানিতে এ রাজ্যের জুরিমেলা ভার।

## খেলাধুলা

খেলাধুলায় তামিলনাড়ু কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। এখানকার ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে বিভিন্ন খেলাধুলা জড়িত। কাবাডি তামিলনাড়ুর রাষ্ট্রীয় খেলা। 'কাবাডি' শব্দটি তামিল শব্দ 'কাই-পুদি' থেকে এসেছে যার অর্থ 'হাত ধরা'। ঐতিহ্যবাহী খেলা 'জাল্লিকাট্টু' এখানকার খুবই প্রাচীন একটি খেলা, যেখানে একটি ছুটন্ত-উন্মত্ত ষাঁড়কে নানা কসরতের পরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এক দল মানুষ। এছাড়াও পশ্চিমীয় খেলা ফুটবল ক্রিকেট, হকি, টেনিস এখানে প্রচলিত রয়েছে। •

মিজান স্বপন
শিল্পী

বিশেষ নিবন্ধ

# প্রাচীন ভারতে রূপচর্চা

**শামিম আহমেদ**

জুয়া খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে পাণ্ডবদের হলো বারো বছর বনবাস আর এক বছরের অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাসে থাকার সময় যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়াবিদের ছদ্মবেশে ছিলেন, ভীম হয়েছিলেন পাচক, অর্জুন নাচ-গানের শিক্ষক, নকুল-সহদেব দুই ভাই অশ্ব আর গোরু বিশেষজ্ঞ। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাইয়ের কৃতিত্ব ছিল। দ্রৌপদী নিয়েছিলেন সৈরন্ধ্রীর ভূমিকা।

সৈরন্ধ্রী কাকে বলে? সোজা কথায় এর মানে বিউটিশিয়ান। তাঁর সঙ্গে একটি পেটিকা ছিল, সেটি নিয়েই তিনি ঢোকেন বিরাট রাজার মহিষী সুদেষ্ণার অন্দরমহলে। রানিকে সাজানো ছিল তাঁর প্রধান কাজ। দ্রৌপদী শুধুই কি চন্দন বাটতেন আর পায়ে আলতা লাগাতেন? না। শুনলে চমকে যেতে হয় সেই রূপচর্চার আখ্যান। তার আগে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া জরুরি।

ইতিহাস বলে, প্রসাধনবিদ্যার উৎপত্তি হয়েছিল প্রাচীন মিশর এবং ভারতে। তবে প্রসাধনী দ্রব্যের প্রাচীনতম রেকর্ড এবং সে সবের প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতায়। আনুমানিক ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। প্রাচীন ভারতে রূপচর্চা ও সৌন্দর্যের ধারণা ছিল অনেক উন্নত

পুরুষ ও মহিলা উভয়েই বিভিন্ন প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহার করতেন, এমন প্রমাণ রয়েছে। পুরুষদের রূপচর্চার যে কী ভীষণ প্রয়োজন আছে, তা মহাভারত খুললেই বোঝা যায়। মহাভারতের লেখক পরাশরপুত্র ব্যাসদেব। তিনি বন-জঙ্গলে থাকতেন, ঋষি মানুষ, নিজের রূপ নিয়ে ভাবতেন না তিনি। তাঁর গায়ে ছিল ঘামের গন্ধ, দাঁড়ি চুলে ছিল জটা। কিন্তু যদি এমন না হতো, তাহলে হয়তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটাই হতো না। সে কী রকম?

ব্যাসদেব যখন তাঁর সহোদর বিচিত্রবীর্যের দুই বিধবা পত্নীর কাছে এলেন সন্তান উৎপাদন করবেন বলে, তখন কী হলো? সেই দুই রানির কেউই ব্যাসদেবের গায়ের কটু গন্ধ সহ্য করতে পারেননি। তাঁরা ছিলেন সুসজ্জিতা রাজকন্যা, রাজবধূ। মুনির এমন রূপ দেখে অম্বিকা নামের বিধবা রানি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। আর অম্বালিকা? তিনি তো মুনির চেহারা আর গায়ের গন্ধে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তাঁর গায়ের রঙ হয়ে গেল ফ্যাকাশে বা পাণ্ডুর। ফলে একজনের জন্মালো অন্ধ পুত্র। আর অন্যজনের ছেলে পাণ্ডু, জন্ম থেকেই খুব দুর্বল। ব্যাসদেব নিজের পোশাক-আশাক কিংবা রূপচর্চা নিয়ে একেবারেই ভাবিত ছিলেন না। অথচ তিনি মহাভারতে পুরুষের নানা রকম পোশাকের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলছেন, যে পোশাক পরে যুদ্ধে যাবেন সেই পোশাক পরে নারীগমন করা যাবে না। আবার শিকারে যাওয়ার পোশাক হবে একেবারেই অন্য রকম। পুরুষের সাত রকম পোশাকের বর্ণনা দিয়েছেন ব্যাসদেব কিন্তু নিজে সে সব পোশাক একেবারেই পরতেন না। অথচ তাঁর উপরে ন্যস্ত ছিল রাজপরিবারের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্ম।

প্রাচীন ভারতে নারী এবং পুরুষ উভয়ের রূপচর্চা ছিল ঋতুকেন্দ্রিক। প্রত্যেকের সাজগোজ জীবনের স্বাভাবিক আচার-আচরণের সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহার যেমন মানুষকে মনোরম এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের দিকে নিয়ে যায়, তেমনি উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনের দিকেও ঠেলে দেয়। রূপচর্চার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন লাভ। রূপচর্চায় মানুষ পায় সুখ আর আনন্দ, যা জীবনের জন্য খুব জরুরি।

মহাভারতের দ্রৌপদীর কথায় ফিরে যাই। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে যখন দ্রৌপদীর বিয়ে হয়, তখন তাঁর শরীরে বহু অলঙ্কার ছিল। গলায় হার, কানে দুল, নাকে নথ, হাতে বালা-চুড়ি, পায়ে মল–অনেক কিছু। কিন্তু নিজের বিয়েতে কেমন শাড়ি পরেছিলেন দ্রৌপদী? তখন তো বেনারসি বা জামদানি ছিল না। মহাভারত বলছে, বিয়ের সময় দ্রৌপদী পরেছিলেন ক্ষৌমবস্ত্র। একে অতসীবসন বা পট্টবস্ত্র বলা চলে। কু কিংবা গাছের পাতা থেকে এই কাপড় বানানো হতো। দ্রৌপদী বিয়ের দিন হলুদ রঙের শাড়ি পরেছিলেন বলে জানা যায়। অর্জুনের আর এক স্ত্রী সুভদ্রা ছিলেন বলরামের বোন। তিনি বিয়ের দিন পরেছিলেন লাল রঙের শাড়ি। মহাভারত বলছে, সুভদ্রার পরনে ছিল রক্তবর্ণের কৌশেয় বস্ত্র। কুশ ঘাস দিয়ে বানানো এই পোশাকে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন। মহাভারতের পুরুষরাও নানা রঙের জামাকাপড় পরতেন। দ্রোণাচার্য ও কৃপ অস্ত্রগুরু হলেও তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁরা সাদা রঙের কাপড় পরতেন। কর্ত পরতেন পীত বা হলুদ রঙের পোশাক। বস্ত্রের রঙের ব্যাপারে দ্রৌপদীর সঙ্গে কর্ণের মিল ছিল। অশ্বত্থামা ও দুর্যোধন ভালবাসতেন নীল রঙের পোশাক। নীল রঙের পোশাক পরতেন বলরামও। পাণ্ডবরা নানা রঙের জামাকাপড় পরতে অভ্যস্ত ছিলেন। দুর্যোধনের সাজপোশাক ছিল সিনেমার নায়কদের মতো। যেমন তাঁর লম্বা চুল তেমনই অপূর্ব চেহারা। তিনি দীর্ঘদেহী ছিলেন, তাঁর গায়ের রঙ ছিল তপ্ত কাঞ্চনের মতো। অর্জুনের মাথায় ছিল বেণি। কেউ কেউ শৃঙ্গের আকারে কেশ বিন্যাস করতেন। কৃষ্ণের এবং অভিমন্যুর মাথায় ছিল কাকপক্ষ। কেউ কেউ মাথায় পাঁচটি শিখা বা চৈতন রাখতেন, একে বলে কাকপক্ষ। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, কাকপক্ষ মানে হলো জুলপি।

ধৃতরাষ্ট্র একবার দুর্যোধনকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, 'তুমি প্রাবার পরিধান করছ, আবার পোলাও-মাংস খাচ্ছ, তাও তোমাকে অত দুঃখি-দুঃখি লাগে কেন?' প্রাবার হলো সৌখিন কেতাদুরস্ত উত্তরীয়। দুর্যোধন খাওয়া দাওয়া ও পোশাক-আশাকের ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন। সে যুগে পুরুষরাও গয়না পরতেন। কানে দুল পরতেন অধিকাংশ যুবক। এছাড়া পুরুষরা পরতেন অঙ্গদ বা বাহুভূষণ। রাজপুরুষরা বহুমূল্যের সোনার মুকুট থেকে হাতের বালা নানা জিনিস পরিধান করতেন। তাঁদের চুলের বিন্যাসও ছিল দেখবার মতো। সে সময়ের সাজগোজে সোনার ব্যবহার ছিল খুব বেশি।

মেয়েরা সুবর্ণমালা, কুণ্ডল বা দুল, নানা রকম মণিরত্ন, নিষ্ক, কম্বু, কেয়ূর ব্যবহার করতেন। দ্রৌপদীও এই সব অলঙ্কারে নিজেকে সাজাতেন। নিষ্ক সেই সময়ের ব্যবহার-করা সোনার মুদ্রা, যা আংটি হিসাবে অনেকে ব্যবহার করতেন, কেউ বানাতেন গলার হারের লকেট। আর কম্বু হলো শাঁখা। কেয়ূর বাহুভূষণ বা আর্মলেট। দুই ভ্রুর মাঝখানে একটি কৃত্রিম চিহ্ন আঁকতেন দ্রৌপদী। এটি হলো রক্ততিলক আকৃতির টিপ। একে বলা হয় 'পিপ'। দময়ন্তীর এই চিহ্নটি ছিল সহজাত। এটিকেও মহাভারতকার অলঙ্কার বলেছেন।

প্রসাধন হিসাবে দ্রৌপদী যা যা ব্যবহার করতেন তার মধ্যে চন্দন ছিল প্রধান। পুরুষ এবং স্ত্রী–সকলে শরীরে চন্দন মাখতেন। চন্দনের সঙ্গে দ্রৌপদী মেশাতেন অগুরু। বিরাট রাজার অন্তঃপুরে দ্রৌপদী যখন বিউটিশিয়ানের কাজ করছেন তখন তাঁকে চন্দন বাঁটতে হতো নিয়মিত। চন্দন তো অনেকেই বাঁটে। কিন্তু দ্রৌপদীর চন্দনে কিছু বিশেষত্ব ছিল। তিনি চুপিসারে 'তুঙ্গ' নামের এক গন্ধদ্রব্য তাতে মিশিয়ে দিতেন। এর ফলে চন্দনের গন্ধ অন্য মাত্রা পেত। তুঙ্গ হলো হলুদ ও নারকেলের নির্যাস দিয়ে বানানো এক ধরনের সুগন্ধি। দ্রৌপদীর শরীর থেকে অনেকেই একটা সুন্দর গন্ধ পেতেন। জানা যায়, স্নানের আগে পঞ্চ পাণ্ডবের স্ত্রী মাখতেন ইঙ্গুদ তেল। এই তেল যেমন শরীরের ব্যথা দূর করে তেমনি এর সুগন্ধও দেহে থাকে বহুক্ষণ। ইঙ্গুদ তেল তৈরি হয় মূলত হিং থেকে, হিন্দিতে একে বলে হিঙ্গোলি। আর একটি তেলও ব্যবহার করতেন দ্রৌপদী, তার নাম এরণ্ড। এরণ্ড হলো এখনকার ভাষায় ক্যাস্টর বিন অয়েল। এই তেল ব্যবহার করলে স্নায়ুতন্ত্র চনমনে থাকে।

মহাভারতে প্রসাধনী শব্দটির নানা প্রয়োগের কথা আছে। প্রসাধন কী করে? তা শরীর পরিষ্কার করে, ত্বকের সমস্যা দূর করা, বিভিন্ন দাগ বা প্রত্যঙ্গের অসম্পূর্ণতা ঢেকে রাখে আর মানুষের চেহারাকে সুন্দর করে।

দেহকে সুন্দর করে তোলার জন্য বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন লেপন বা মাস্কের কথা আছে প্রাচীন সাহিত্যে। ঠান্ডা ঋতুতে ব্যবহার করা জিনিস গরমকালে ব্যবহার করা যেত না। আবার বর্ষার ও বসন্তের প্রসাধন আলাদা ছিল। কোন প্রাচীন সাহিত্যে সেই সব কিছুর হদিশ পাওয়া যায়?

সেটি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের একটি গ্রন্থ। বইটির নাম অষ্টাঙ্গ হৃদয়। মনে করা হয় এটি ১৫০০ বছর আগের গ্রন্থ। এই বইতে বছরের ছয়টি ঋতুর জন্য ছয়টি আলাদা আলাদা লেপন ব্যবহারের কথা আছে। একইভাবে মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রসাধনী তৈলম্ এবং ঘৃতের উল্লেখ আছে। চুল কমে গেলে মানুষ শ্রীহীন হয়ে গেছেন বলে মনে করেন, তেমনি অতিরিক্ত চুলও সৌন্দর্যকে ঢেকে দেয়। এর থেকে রক্ষা পেতে নানা রকমের ওষুধের কথা বলা হয়েছে শাস্ত্রে। চুল পরিষ্কার করার জন্য বিশেষ বিশেষ উপাদান ব্যবহার করা হতো। চুলের বৃদ্ধি, চুল পড়া রোধ এবং অকালে চুল পেকে যাওয়ার জন্য অনেক প্রতিকার নির্দেশিত হয়েছে।

সাদা বা ধূসর চুল, এমনকি কালো চুলেও কীভাবে রঙ করতে হবে, তার নির্দেশ আছে এই শাস্ত্রে। চুলের রঞ্জক কীভাবে বানাতে হবে, কেমন ভাবে চুলকে সুগন্ধি করে তুলতে হবে, চুলের খারাপ গন্ধ ধুয়ে ফেলা সম্পর্কে বহু নিদান রয়েছে। সুগন্ধি ধোঁয়া ব্যবহার করে চুলকে গন্ধময় করে তুলতেন অনেকে। স্নানের পর সুগন্ধি পাউডারের ব্যবহার, শরীরে ডিওডোরেন্টের প্রয়োগের উল্লেখ বার বার পাওয়া যায়। এছাড়া দাঁতের যত্ন, মুখগহ্বরের গন্ধ দূর করা আর ঠোঁট রঙ করার মতো মৌখিক স্বাস্থ্যবিধি ছিল সে যুগে।

প্রাচীন ভারতে লিপবাম বা ঠোঁটের ক্রিমের সন্ধান পাওয়া যায়। শীতকালে ঠোঁট ফাটে, ফাটা ঠোঁটের ব্যথার পাশাপাশি মুখের সৌন্দর্যও নষ্ট হয়। এমন ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিকারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে।

মানব দুগ্ধে বেলের ছাল গুঁড়ো করে মেশাতে হবে। তারপর ওই মিশ্রণটি ফাটা ঠোঁটে প্রয়োগ করতে হবে। আচার্যরা জানাচ্ছেন এর ফলে ১০ দিনের মধ্যে ঠোঁট ফাটা সেরে যাবে।

ত্বকের জেল্লা বাড়াতে আয়ুর্বেদ আর একটি মিশ্রণের নিদান দেয়। কুষ্ঠ মূল, সাদা তিল, সিরিসার পাতা, চোপড়া পাতা, দেবদারু কাঠ, হলুদ একসঙ্গে গুঁড়ো করতে হবে। এরপর মোষের গোবরের ঘুঁটের জ্বালানিতে লোহার কড়াইতে মিশ্রণটিকে ভাজতে হবে। তারপর জল দিয়ে এই যৌগ থেকে পেস্ট তৈরি করতে হবে। সেটি টানা তিন দিন শরীরে লাগালে ত্বকের

জেল্লা বাড়বে। চুলে খুশকি হলে কী করবেন? তাও জানাচ্ছে প্রাচীন শাস্ত্র। খসখস বীজের পেস্ট ছাগলের দুধ মিশিয়ে মাথার চামড়ায় লাগালে তিন দিনে খুশকি উধাও হয়ে যাবে।

আপনাকে দেখতে বুড়ো-বুড়ো লাগছে? মনে হচ্ছে বয়সের ছাপ বড় বেশি পড়েছে শরীরে, কী করবেন? আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের এই বইটি কায়কল্প বা পুনর্জীবন প্রক্রিয়ার কথা জানিয়েছে। সেটা আবার কী? কায়কল্পের মধ্য দিয়ে গেলে আপনার বয়স কমে যাবে, আপনাকে তরুণ বা তরুণী মনে হবে। চুলের রঙ পালটে যাবে, ত্বকের বলিরেখা উধাও হয়ে যাবে, চালসের চশমা লাগবে না। ভাবছেন তো, কায়কল্প কী?

সমান পরিমাণে নিতে হবে কদুনিম্ব পাতা, মাকা পাতা, গোরক্ষমুন্ডি, নির্গুন্ডি আর ভোভা পাতা। এই বার পাঁচটি উপাদানকে রোদে শুকিয়ে নিন। শুকিয়ে গেলে সব গুলোকে একসঙ্গে গুঁড়ো করে নিতে হবে। প্রত্যেক দিন দু চিমটে করে দিনে দু বার খান। তবে আপনার খাদ্য তালিকায় দুধ ও ভাত থাকা আবশ্যক। এক সপ্তাহ খেলে আপনাকে আরও কম বয়সী দেখাবে, ত্বক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং এমনকি ধূসর চুলও কালো হয়ে যাবে।

রূপচর্চার আর একটি বিষয় হলো, দেহের অবাঞ্ছিত লোম তুলে ফেলা। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলে, এই লোমের উপস্থিতিতে চোখের খুব ক্ষতি হয়। কীভাবে তুলবেন এই সব লোম? শুকনো আভালাকাট্টি ফল এবং শুষ্ক পিপ্পলি ফল একসঙ্গে গুঁড়ো করুন। এই বার মিশ্রণটি গরুর ঘন দুধে সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। এই যৌগটি আপনার হেয়ার রিমুভারের কাজ করবে। নির্দিষ্ট জায়গায় এই মিশ্রণ প্রয়োগ করলে সেখানকার লোম দূর হবে। শোনা যায়, বনবাসে রামচন্দ্র ও লক্ষণ দাঁড়িতে এই মিশ্রণ লাগাতেন।

বুককে সুদৃঢ় করে তোলার প্রয়াস আছে আয়ুর্বেদে। অশ্বগন্ধার মূল, গজপিপ্পলি ফল, কুষ্ঠ মূল ও ভেখন্ডার পাউডার তৈরি করুন। এই বার ওই পাউডারে মোষের দুধ থেকে তৈরি মাখন যোগ করুন। মিশ্রণটিকে বুকে নিয়মিত ম্যাসাজ করলে পুরুষ ও মহিলার বুক সুদৃঢ় ও সুঠাম হবে।

মুখমণ্ডলের যত্ন কীভাবে নিতেন প্রাচীন ভারতীয়রা? খুব সাধারণ এক ভেষজ উপাদান ব্যবহার করতেন তাঁরা। সাধারণ মুসুর ডাল। সেটিকে ভিজিয়ে রেখে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে সাত দিন মাখলে নাকি মুখমণ্ডল পদ্মফুলের পাঁপড়ির মতো হবে। এমনটাই জানাচ্ছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের গ্রন্থ অষ্টাঙ্গ হৃদয়।

মুখে ব্রণ হয়েছে? নিরাময় কীভাবে করবেন? ধনিয়া বা ধনে নিন। ধনিয়ার সংস্কৃত নাম কুস্তম্বরু। তার সঙ্গে মেশান ভেখন্ডা, কুষ্ঠমূল আর লোধরা। একসঙ্গে বেটে পেস্ট করে ব্রণে লাগালে এক হপ্তায় ব্রণ সেরে যাবে। শোনা যায়, বালক রাজা তুতানখামেন ধনিয়া বেটে মুখে লাগাতেন। তুতানখামেনের কবরে নানা জিনিসের সঙ্গে পনেরোটি ধনেও রাখা হয়েছিল।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মাউথ ফ্রেশনারের কথা বলেছে। সেই মাউথ ফ্রেশনার বানাতে গেলে লাগবে–সুপারি, কুষ্টমূল, তাগারা, যতিফল, কর্পূর আর এলা।

মাথায় উকুন নিয়ে সব যুগের মানুষ ভুগেছেন। উকুন হলে কী করতে হবে, তাও বলা আছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে। ফণিভল্লী বা পান পাতার রসে কাপড় ডুবিয়ে সেই কাপড়ের টুকরো দিয়ে মাথা বেঁধে রাখলে উকুন পালাবে মাথা ছেড়ে। চুলের বহুবিধ যত্নের কথা আছে প্রাচীন সাহিত্যে। ভৃঙ্গরাজ বা মাকার রস লোহার পাত্রে নিয়ে ত্রিফলার গুঁড়ো, হারাদা, বেহেদা ও আমলকি মিশিয়ে গরম করতে হবে। ওই তরল চুলে মাখলে চুল কালো, ঘন ও উজ্জ্বল হবে।

শরীরে ঘামের গন্ধ হলে ডিওডোরেন্ট পাউডার লাগান অনেকে। প্রাচীন ভারতীয়রা কী লাগাতেন? আম গাছ ও ডালিম গাছের বাকল থেকে তৈরি করতেন পাউডার, তারপর তাতে মেশাতেন শঙ্খচূর্ণ। ওই মিশ্রণ শরীরের প্রাসঙ্গিক অংশে লাগালে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যেত।

মহাভারতে দ্রৌপদী মাথায় ও গলায় ফুলের মালা পরতেন। রক্তমাল্য গলায় পরা নিষেধ ছিল। পদ্ম বা কুবলয়ের মালা অর্থাৎ কুমুদমালা পরার উপরও নিষেধাজ্ঞা ছিল। দ্রৌপদী ফুল খুব ভালোবাসতেন। তিনি মনে করতেন, ফুল মানুষের শরীর ও মনকে শ্রীময় করে তোলে। তিনি ফুলকে ডাকতেন 'সুমনস' বলে। দ্রৌপদী দিনের প্রথম দিকে কেশ প্রসাধন করতেন, চোখে অঞ্জন পরতেন।

দ্রৌপদীর চুল ছিল দেখার মতো। সেই চুলে বেণি না করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি, যতদিন না কৌরবদের বিনাশ হচ্ছে। তিনি খুব লম্বা দৈর্ঘ্যের শাড়ি পরতেন। মহাভারতে বিধবাদের রূপচর্চা নিয়ে কড়া অনুশাসন ছিল। তাই সত্যবতীকে আমরা তেমন সাজতে দেখি না।

মহাভারতের এক বিখ্যাত চরিত্র শকুন্তলা। তাঁর মা ছিলেন অপ্সরা মেনকা। মেনকা সাজগোজ করতে খুব ভালোবাসতেন। শকুন্তলা আশ্রম বালিকা হলেও সাজ পোশাকের ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন। কন্ব মুনির আশ্রমে তিনি যখন অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সঙ্গে বেড়ে উঠছেন তখন তিনি অধোবস্ত্রম শাড়ি পরতেন। এতে দেহের অনেকখানি অংশ খোলা থাকতো। সেই শরীরের দিকে তাকিয়ে রাজা দুষ্মন্ত চোখ ফেরাতে পারেননি। শকুন্তলা কানে পরতেন ফুল, গলায় ফুলের মালা। দ্রৌপদী ও শকুন্তলা দুজনেই অ্যারোমা থেরাপি করতেন। বিশেষ কিছু গাছের তেল গরম করে ছেঁকে মাথায় ও সারা শরীরে মাখতেন। পদ্মের নির্যাসকে তাঁরা সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করতেন। তালপাতায় তৈরি করতেন কাজল। দ্রৌপদী ছিলেন কালো আর শকুন্তলা ফর্সা। দুজনেই ত্বকের যত্ন নিতেন। মুখে নানা রকমের তেল ছাড়াও মাখতেন এক বিশেষ ধরনের খড়ি। ঘুমোতে যাওয়ার আগে নাইট ক্রিম হিসেবে ব্যবহার করতেন ভেড়ার গায়ের ঘাম। এছাড়া ফলের রস, নানা রকমের বীজ বেটে মুখে লাগানোর রেওয়াজ ছিল। ভিনিগার, পাখির ডিম, পেঁয়াজের রস, দুধ ইত্যাদি মাখার প্রচলন ছিল। স্নানের আগে মহাভারতের তরুণীরা মুখে লাগাতেন সাদা মাটি, কুমিরের বর্জ্য, গোলাপ জল, প্রাণীর চর্বি আর বাদাম তেল। ব্ল্যাক হেডস বা কালো দাগ দূর করতে মুখে লাগানো হত শামুক ভস্ম। দ্রৌপদী রাজপ্রাসাদে থাকার সময় জামাকাপড় ইস্ত্রি করে পরতেন। মহাভারতকার বহ্নিশৌচ বস্ত্রের কথা বলেছেন।

রামায়ণের প্রধান চরিত্র সীতাও রূপচর্চায় কিছু কম যান না। সীতা যখন রাজপ্রাসাদে তখন তাঁর পোশাক-আশাক ছিল অন্যান্য রাজবধূদের মতোই। সীতার অলঙ্কারের কথা আমাদের সকলের জানা। রাবণ যখন তাঁকে হরণ করে নিয়ে যান, তখন তিনি একের পর এক গয়না রাস্তায় ছুড়ে ফেলছেন। যাতে করে পরে বোঝা যায়, কোন রাস্তা দিয়ে তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রামচন্দ্র যখন চিত্রকূট ছেড়ে অত্রি মুনির আশ্রমে যান, তখন অত্রি মুনির স্ত্রী অনসূয়া সীতাকে অনেক প্রসাধন দ্রব্য, জামাকাপড় আর গয়না উপহার হিসাবে দেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণে সে সবের বর্ণনা আছে। টিকলি থেকে সিন্দুর, কণ্ঠের মণিময় হার থেকে বাহুতে কেয়ূর, কানের দুল থেকে পায়ের নূপুর, নাকে গজমুক্তার নথ থেকে কোমরের বিছেহার।

স্নানের সময় কি সাবান মাখতেন মহাকাব্যের নায়িকারা? বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে 'ফেনল' নামের একটি বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় যা স্নানের সময় গায়ে ঘষা হতো। ফেনল হলো অরিষ্ট ফল যাকে আমরা রিঠা বলি।

দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে রূপবান চন্দ্র। তিনি রূপচর্চাও করতেন খুব। এককালে তিনি দেবতাদের রাজা ছিলেন। তাঁর নিজের ২৭টি স্ত্রী। কিন্তু চন্দ্রের রূপের আকর্ষণ এমন যে অন্যান্য দেবতাদের স্ত্রীরা চন্দ্রের বাড়ির চারপাশে ঘুরঘুর করত। দেবতাদের গুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারা চন্দ্রের বাড়িতে এসে থেকে গিয়েছিলেন বহু দিন। তাঁদের পুত্রের নাম বুধ। বুধ হলো চন্দ্রবংশের প্রথম পুরুষ। মহাভারতের কাহিনি হলো চন্দ্রবংশীয়দের আখ্যান।

মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডব ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রূপবান ছিলেন নকুল। তিনি রূপচর্চাও করতেন। অশ্বিন তাঁর পিতা, যিনি ছিলেন স্বর্গবৈদ্য। এই স্বর্গবৈদ্য বৃদ্ধকে তরুণ করতে পারতেন। বৃদ্ধ চ্যবন মুনিকে অশ্বিন ও রেবন্ত দুই ভাই বিভিন্ন গাছের লতাপাতা, বীজ, ফল মিশিয়ে একটি জিনিস বানিয়ে খাওয়ান। আর তাতেই চ্যবন মুনি হয়ে ওঠেন যুবক। নকুলের পিতা অশ্বিন ও কাকা রেবন্ত চ্যবনমুনিকে যে জিনিসটা খাইয়েছিলেন তার নাম 'চ্যবনপ্রাশ'।

শামিম আহমেদ
প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক

অতিরিক্ত রূপচর্চার কারণে, এবং 'তিনি রূপবান'–এই অহংকারের জন্য, 'পায়ে হেঁটে স্বর্গ' যাত্রার পথে দ্রুত মৃত্যু হয় নকুলের। •

# বন্দেমাতরম্

## আমিরুল আবেদিন

বন্দে মাতরম অর্থ 'মাকে বন্দনা করি'। দেশকে মা হিসেবে কল্পনায় বন্দনা। ঠিক কবে বঙ্কিম এই গানটি লিখেছেন সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যায়নি। তবে ১৮৭৬-এ তিনি ব্রিটিশদের অধীনে চাকরি করার সময়েই গানটি লেখার মানসিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেছিলেন ১৮৭২-১৮৭৬ সালে। সম্পাদনার সময় একবার তিনি ৮ মাস ছুটি নিয়ে নৈহাটির কাঁটালপাড়ায় নিজের বাড়িতে আসেন। ধারণা করা হয় এখানেই তিনি বন্দেমাতরম্ গানটি লেখেন। বঙ্কিম সচরাচর তার লেখা প্রকাশের আগে কাউকে পড়তে দিতেন না। এজন্য তার কোনো লেখার রচনাকাল খুঁজে পাওয়া কঠিন। বঙ্গদর্শনে যখন আনন্দমঠ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল তখন

'বন্দে' এবং 'মাতরম' ছিল আলাদা দুটো শব্দ। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত সেটাই ছিল। তারপর থেকে হয় একটি শব্দ, 'বন্দেমাতরম্'।

বন্দেমাতরম্ গানটি বঙ্কিমের সচেতন প্রয়াস। মহৎ যেকোনো সাহিত্যিক তার সাহিত্যকর্মের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব কি হতে পারে তা মানসপটে স্থির করে রাখেন। বন্দেমাতরমের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমের এমন ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা ছিল। প্রমাণস্বরূপ একটি ঘটনা লিখা হলো।

বঙ্গদর্শনে কখনো লেখা কম পড়লে ছাপাখানার পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বাড়তি লেখা চাইতেন। তখনো 'আনন্দমঠ' লেখেননি। বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তিনি টেবিলের ওপর বন্দেমাতরম্ গানটির লেখা কাগজ দেখতে পেলেন। কোনোকিছু না ভেবেই বললেন, 'এই লেখাটা দিয়ে দিন। এটা মন্দ হয় না।' বঙ্কিম বেশ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'এটা ভালো না মন্দ তা এখন বুঝবে না। কদিন পরে বুঝবে।' বলেই লেখাটি দেরাজে তুলে রাখেন। অর্থাৎ বন্দেমাতরমের প্রভাবনী ক্ষমতা সম্পর্কে বঙ্কিম অনেক আগেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তিনি অপেক্ষা করছিলেন এই গানটি প্রকাশের। ১৮৮২ সালে সেই সুযোগ এলো। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তিনি যুক্ত করলেন বন্দেমাতরম্ গানটি। নিজের কন্যাকে বঙ্কিম একবার বলেছিলেন, 'একদিন দেখিবে–বিশ ত্রিশ বৎসর পর একদিন দেখিবে এই গান লইয়া বাঙালা উন্মত্ত হইয়াছে–বাঙালী মাতিয়াছে।' তার কথা সত্যই হয়েছিল। ১৯৫০ সালে গানটি ভারতের জাতীয় স্তোত্রের মর্যাদা পায়।

### গানে রূপায়নের বর্ণিলতা

১৮৮২-এ 'আনন্দমঠ' প্রথমবার প্রকাশ হওয়ার পর 'বন্দেমাতরম্' গানের নিচে লেখা ছিল 'মল্লার রাগ। কাওয়ালি তাল।' তখন সুর দিয়েছিলেন যদুভট্ট। যদিও পরে তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্দে মাতরম-এর স্বরলিপি প্রকাশ করলেন 'দেশ' রাগে। সুর করার পর সাহিত্যসম্রাটকে তিনি শুনিয়েছিলেনও। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের তা বেশ পছন্দ হয়েছিল। ফলে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের পরের সংস্করণেই লেখা হলো 'দেশ রাগ'। তবে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে ১৮৯৬ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম্' গানটি প্রথম গাওয়া হয়। সেই অধিবেশনে 'দেশ রাগে' গানটি গেয়ে শোনান রবীন্দ্রনাথ। 'নারায়ণ' পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল, কেউ কেউ নাকি সে গান শুনে কেঁদে ফেলেছিলেন। আর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় শোনা গেল বন্দেমাতরম্ স্লোগান। যাকে বলা হলো দেশাত্মবোধের বীজমন্ত্র।

### স্বাধীনতার সংগ্রামে বন্দেমাতরম্

বন্দেমাতরম্ ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল। রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে এটি এতটাই সাংস্কৃতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিল যে ব্রিটিশ সরকার জনসমক্ষে এই গান গাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু বন্দেমাতরম্ স্লোগান বন্ধ হয়নি। ১৯০১ সালের কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে গানটি পরিবেশন করেছিলেন দক্ষিণাচরণ সেন। রবীন্দ্রনাথ সুর বসিয়েছিলেন প্রথম দুটি স্তবকে। বাকিটুকু শেষ করলেন তাঁর ভাগ্নি সরলা দেবী। সরলা দেবীকে ঘিরেই ওই স্লোগানের জন্ম। চার বছর পর কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে তিনি গানটি পরিবেশন করেন। ১৯০৫ সালে হীরালাল সেন ভারতের বুকে যে প্রথম রাজনৈতিক চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন, তার সমাপ্তি হয়েছিল বন্দেমাতরম্ দিয়ে। বন্দেমাতরম্ হিন্দুয়ানি স্লোগান বলে মুসলমানরা কিছুদিন পরই ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান চালু করে। বন্দেমাতরমের প্রভাব এতটাই বিস্তৃত ছিল যে ইংরেজরা এই স্লোগানটিকে ভয় পেত। মদনলাল ধিংড়া, প্রফুল্ল চাকি, খুদিরাম বসু, মাস্টারদা সূর্য সেনসহ বহু বিপ্লবীর ফাঁসির মঞ্চে শেষ উচ্চারণ ছিল, 'বন্দে মাতরম'। ব্রিটিশ পুলিশের হাতে মৃত্যুবরণের সময় মাতঙ্গিনী হাজরাও শেষ স্লোগান দিয়েছিলেন 'বন্দে মাতরম'। এই স্লোগানের ফলে ভারতীয়দের মনোবল দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে যায় ইংরেজরা। ফলে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীকেই গ্রেফতার করে ব্রিটিশ সরকার।

### আজও প্রাসঙ্গিক

প্রতিবছর ভারতের স্বাধীনতা দিবস হোক কিংবা প্রজাতন্ত্র দিবস, 'বন্দেমাতরম্' গানটি বেজে উঠলেই ফের সজাগ হয়ে ওঠে স্বাধীনতা পর্বের সেই স্মৃতি। •

আমিরুল আবেদিন ॥ অনুবাদক


সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

লেখা পাঠানোর নির্দেশনাবলি

ভারত বিচিত্রায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম ও রাউটিং নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। লেখার কপি রেখে নির্ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ আমাদের কাছে পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা অবশ্যই এমএস ওয়ার্ড (SutonnyMJ)-তে কম্পোজ করে দিতে হবে। সঙ্গে চেকবইয়ের ভেতরের পাতার ছবি তুলে বা স্ক্যান করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। তথ্যসমূহ ইংরেজিতে পূরণ করে ডাকযোগে বা ই-মেইলে পাঠান। অন্যথায় লেখা মনোনীত হলেও আমরা ছাপাতে পারব না। – সম্পাদক

ভারতীয় হাই কমিশন প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২। ই-মেইল: inf2.dhaka@mea.gov.in

Name :..... Pen Name :.....

Address :..... Bank Account Name :.....

..... Account No :.....

..... Bank Name :.....

Phone/Mobile :..... Branch Name :.....

e-mail :..... Routing No :.....

১৯ আগস্ট ২০২৩ বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির পক্ষ থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা আমন্ত্রিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোজাম্মেল হক।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা এবং তাঁর স্ত্রী মিসেস মনু ভার্মা ১৫ আগস্ট ২০২৩-এ বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ঢাকার ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ভারতীয় হাই কমিশন ১১ আগস্ট, ২০২৩-এ ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানকে স্মরণ করতে ধানমন্ডির ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে 'গ্লোরি অব ইন্ডিয়ান আর্ট' প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ৯ আগস্ট ২০২৩-এ টুঙ্গিপাড়া সফর করেন এবং বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি উষ্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ভারতীয় হাই কমিশন, ০১ আগস্ট, ২০২৩-এ বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সাথে আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদ্‌যাপনের আয়োজন করে। মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা এই উদ্‌যাপনের স্মারক হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মের ওপর একটি বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

Regd. No. DA 355, Bharat Bichitra, August, 2023

# ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লাইব্রেরি
হাউজ নং : ২৪, রোড নং : ০২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
টেলিফোন : +৮৮০২৯৬১২৩২২, ইমেইল : lib.dhaka@mea.gov.in

**লাইব্রেরি সময় : রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার ॥ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫.৩০ মিনিট**

লাইব্রেরি মেম্বারশিপ ফরম : www.hcidhaka.gov.in/pdf/membershipapplicationform-292018.pdf

# ভারতীয় ভিসা আবেদনকারীদের জন্য জ্ঞাতব্য

ভারতীয় হাই কমিশন ও ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো এজেন্টের সম্পর্ক নেই।
ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে কোনো ভিসা ফি নেয় না।
ভিসা আবেদন কেন্দ্র ভিসা প্রসেসিং ফি হিসেবে মাত্র ৮০০ টাকা নিয়ে থাকে।

## আবেদন করার আগে দয়া করে এই তথ্যগুলো সম্পর্কে সচেতন হোন।